পরিতোষ মজুমদার

ত্রয়ী [] ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড [] কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
বৈশাখ ॥ ১৩৫৯

প্রকাশক :
শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়
ত্রয়ী
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর :
শ্রীযুগলকিশোর রায়
শ্রীসত্যনারায়ণ প্রেস
৫২এ কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ :
শ্রীগণেশ বসু

উৎসর্গ

ফ্রাউ ফ্রিদা হেফ্‌নারকে—

রয়েট্‌লিনগেন্‌ : পশ্চিম জার্মানী

বিদেশের দিনগুলোয়

যাঁর কাছ থেকে মাতৃসমা স্নেহ পেয়েছি।

এই লেখকের অন্যান্য বই :

জোনাকি মন
কাঁচের আয়না
রাইনের ঢেউ
সান্ পাঁউলির মেয়ে
সায়াহ্ন আকাশ
শেষ বিকেলের আলো
সুদূরের বন্দর
অগ্নিলতা
আলোর সন্ধানে
সউজেলিঙ্গের ঘর-সংসার
রঙের বিবি (বাংলাদেশ)
দুই দিগন্ত (বাংলাদেশ)
সংসার সমুদ্রে
মাইন ক্যাম্প (অনুবাদ)
হিটলারের ডায়েরী
নীল বিদ্রোহের জার্মান পুরোহিত
বিখ্যাত মানুষের যৌন জীবন
কনসেনট্রেসন ক্যাম্প
ফিলাডেলফিয়া রহস্য
কুতুব মিনার—
নরক আউসভিৎজ্
ইত্যাদি।

১৯৪৫ সালের ১৬ই জানুয়ারী আডলফ্ হিটলার নতুন চ্যান্সেলারী ছেড়ে বাংকারে আশ্রয় নেয়। মাটি থেকে প্রায় পঞ্চাশ ফিট নীচে সুদৃঢ় সেই বাংকার। পরবর্তী একশো পাঁচদিন অর্থাৎ ৩০শে এপ্রিল, ১৯৪৫ সালের অপরাহ্ণ পর্যন্ত হিটলার আর সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত দেখেনি। জীবনের শেষ তিন মাস এই বাংকারের মধ্যে থেকেই যুদ্ধ পরিচালনা করেছে। তা'ছাড়া খাওয়া-দাওয়া, টি-পার্টি থেকে সুরু করে বিয়েও সম্পন্ন হয়েছে এই বাংকারে, এই সময় হিটলার তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত সঙ্গীদ্বয় গোয়েরিং এবং হিমলারের বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ পেয়েছে। তারা ফ্যুয়েরারের অজ্ঞাতেই মিত্রশক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে যুদ্ধ বন্ধ করতে চেয়েছে। তবে আরেক বিশ্বস্ত দীর্ঘদিনের সঙ্গী গোয়েবেলস্ কিন্তু হিটলার ছাড়া জার্মানীতে বেঁচে থাকতে চায়নি। পর পর ছটি সন্তানকে বিষাক্ত ইনজেকসান প্রয়োগে হত্যা করে স্ত্রীসহ নিজে আত্মহত্যা করেছে এই বাংকারের মধ্যেই। এককথায় বলা যেতে পারে মাত্র ছত্রিশ ঘণ্টায় পৃথিবীর ভাগ্য বাংকারের মধ্যেই নির্ধারিত হয়ে গেছে।

॥ পরিতোষ মজুমদার ॥

॥ এক ॥

১৬ই জানুয়ারী। ১৯৭৫ সাল। সকাল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ইউ এস এ অষ্টম এয়ারফোর্সের প্লেনগুলো শহর বার্লিনের ওপরে বোমাবর্ষণ করে চলেছে। এক নাগাড়ে। অপরাহ্ণের মরা আলোয় দেখা যায় শহরের ওপরে ধোঁয়ার রাশি ঝুলছে। লেবু-রঙা শীতের সূর্য দিগন্তের দিকে পা বাড়িয়েছে। মাত্র ছ'একজন পথচারীর নজরে আসে সাদা হলদে ডোরাকাটা ফ্যুয়েরারের প্লেনটা নতুন রাইখ্ চ্যান্সেলারীর উপরে উড়ছে। অর্থাৎ, কয়েক সপ্তাহের অনুপস্থিতির পর ফ্যুয়েরার রাজধানীতে আবার ফিরে এসেছে।

বার্লিনবাসীদের তখন কোনদিকে চোখ ফেরাবার উপায় নেই। মিত্রশক্তির বোমায় প্রায় সবারই বাড়ীঘর বিধ্বস্ত। যার আছে, সে আর বাড়ী থেকে এক পা বেরতেও রাজী নয়। শুধু মনে মনে সমানে প্রার্থনা করে চলেছে এ যেন তাদের জীবনে আসা এই ষষ্ঠ শীত মরসুমের রাতটা চন্দ্রালোকিত ফুটফুটে না হয়। তাহলেই রয়াল এয়ারফোর্স বোমাবর্ষণ শুরু করবে। সাধারণত মেঘলা দিনে ওরা শহরের আকাশে হানা দেয় না।

বাংকারটা তৈরী করা হয়েছিল বার্লিনের শহরতলী অঞ্চলে। সাধারণ লোকের দেখার উপায়ও ছিল না। এর অস্তিত্ব জানতো হিটলারের কয়েক শো পারিষদ এবং শহরের মুষ্টিমেয় লোক। নতুন

রাইখ্ চ্যান্সেলারী থেকে একটা টানেল বিরাট বড় বাগানের মধ্যে দিয়ে সোজা বাংকারে চলে গেছে। ব্যবস্থাটা করা হয়েছিল যাতে হিটলারের বাংকারে যাতায়াত কারোর নজরে না পড়ে। অথবা, লোকে যাতে ভাবে যে হিটলার নতুন রাইখ্ চ্যান্সেলারীতেই রয়েছে। এই নতুন রাইখ্ চ্যান্সেলারীটাও হিটলার বানিয়েছিল পুরনো রাইখ্ চ্যান্সেলারী ভেঙ্গে দিয়ে।

ওপর থেকে বাংকারটাকে দেখা যেতো না। শুধু একটা জরুরী বহির্গমনের পথ মাটির ওপরে প্রায় কুড়ি ফিট উঁচু ;অনেকটা স্কোয়ার ব্লক হাউসের মতো দেখতে। আর একটা গোলাকার পিলবক্স্ টাওয়ার তবে শেষ হয় নি। ওয়াচ টাওয়াব হিসেবেই নির্মাণ করা হয়েছিল। বেশ কিছু কাঠেব চৌবাচ্চাও রয়েছে। এয়ার রেঁডেব সময় ব্যবগারের জন্য। আর রয়েছে টাওয়ার এবং জরুরী বহির্দরজার মধ্যে অদ্ভুত ধরনের একটা ট্রেঞ্চ: চারপাশে প্রচুর সিমেণ্ট-কংক্রিট মিক্স্চার পড়া। বাংকারটা শেষ হওয়ার পর তাড়াতাড়িতে কেউ আর সবায় নি।

পুরনো চ্যান্সেলারীর বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে দিয়ে মাত্র একজন সৈনিক পরিচাবক সঙ্গে নিয়ে নিশ্চুপে হিটলার বাংকারে আসে। বিসমার্কের সময় থেকে জার্মান চ্যান্সেলাররা পুরোন রাইখ্ চ্যান্সেলারীতেই থাকতো। হিটলার ১৯৩৮ সালে নতুন রাইখ্ চ্যান্সেলারী তৈরী করলেও পুরনো চ্যান্সেলারী ছেড়ে যায় নি। নতুন রাইখ্ চ্যান্সেলারী আকারে পুরনো রাইখ্ চ্যান্সেলারীর থেকে বৃহদাকার। পুরনো চ্যান্সেলারী ভবন নতুন চান্সেলারী বাড়ীটার একটা অংশ হিসেবে ব্যবহার করা হতো।

প্রায় পঞ্চান্ন ফিট্ মাটির নীচে বাংকারটা। বাংকারের ছাদ ষোল ফিট্ কংক্রিটে পুরু। এবং দেওয়াল ছ'ফিট্ চওড়া। ছাদের ওপরে তিরিশ ফিট্ পর্যন্ত মাটি চাপানো। যেদিন থেকে হিটলার বাংকারে আশ্রয় নেয়, সেদিন থেকে এটা ফ্যুয়েরার বাংকার হয়ে দাঁড়ায়। ছোট হয়ে আসা রাজত্ব যাকে থার্ড রাইখের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা যেতে

পারে, বাংকারে এসে জড়ো হয়। বাংকারের ভেতরটাও মোটেই সুদৃশ্য নয়। মলিন। বিষাদেব ছাপ এখানে ওখানে। ছাদ অত্যন্ত নীচু; করিডর এতো সংকীর্ণ যে হামাগুড়ি দিয়ে চলার অবস্থা। গোটা তিরিশেক জড়াজড়ি করা ঘরের মধ্যে কয়েকটার দেওয়ালে যুদ্ধজাহাজের মতো বাদামী রঙ করা হয়েছে। করিডরের দেওযালও নোংরা বাদামী রঙের। জায়গায় জায়গায় সিমেন্ট ভেজা। বোঝা যায় রাজমিস্ত্রীরা প্লাসটারিংয়ের কাজ শেষ করতে পারে নি। মাত্র তিনটে অপেক্ষাকৃত বড় ঘর। দশ ফিট্ বাই পনরো ফিট্। সঙ্গে একটা বাথকম আর স্নানের ঝরণা নিয়ে হিটলারের প্রাইভেট কোয়ার্টার। সেই কোয়ার্টারের আসবাবপত্রও গোনাগুনতি। বসার ঘরে একটা কোচ্, একটা কফি টেবিল আর তিনটে চেয়ার। শোওয়ার ঘরে একটা সিংগিল খাট, নাইট্ আর ড্রেসিং টেবিল।

বাংকারটা শুধু ফ্যুয়েরারের থাকার জায়গা হিসেবেই ব্যবহার করা হতো না, ফ্যুয়েরারের হেড কোয়ার্টার ছাড়াও থার্ড রাইখের সুপ্রিম মিলিটারী হেড কোয়ার্টার ছিল এটা। তেরটা কমাণ্ড পোষ্টের মধ্যে এটাই ছিল সর্বশেষ কমাণ্ড পোষ্ট—যেখান থেকে হিটলার যুদ্ধ পরিচালনা করতো। অবশ্য বলাবাহুল্য, যুদ্ধের পরিধি তখন অনেক ছোট হয়ে এসেছে। আগের বারোটা কমাণ্ড পোষ্ট থেকে হিটলার যে যুদ্ধ পরিচালনা করেছে, তার বিস্তৃতি ছিল সমস্ত ইউরোপ ছাড়িয়ে; নর্থ কেপ্ অফ্ নরওয়ে থেকে আফ্রিকার মরুভূমি। পাইরিনেস্ থেকে ককেশাস্।

পুরনো রাইখ্ চ্যান্সেলারীর শোওয়ার ঘর থেকে বাংকারের শোওয়ার ঘরের দূরত্ব বড়জোর শ'খানেক গজ হলেও হিটলারের এই ঐতিহাসিক যাত্রা সবার অলক্ষ্যে ঘটে। নিঃশব্দে হিটলার যখন পুরনো চ্যান্সেলারী ছেড়ে বাংকারে আসে, অনেকে ভেবেছে ফ্যুয়েরারের রুটিন ইনস্পেকসান মাত্র। তৎকালে যারা ওকে ঘিরে ছিল, তারা বহুদিনের বিশ্বস্ত সহকর্মী। সুতরাং তাদের চোখে হিটলার যতোটা বস্, ততোটা ফুয়েরার নয়। সৈনিক পরিচারক সার্জেন্ট আর্নকেথও

উঁচুপদে ছিল না। জুনিয়ার হলেও হিটলারের জীবনের শেষ পর্বের নিত্য সহচর। ওর বিশ্বস্ততার জন্যই হিটলার ওকে বেছে নিয়েছিল। কারণ ওপরের দিকে হিটলার যাদের প্রচণ্ড বিশ্বাসী বলে ভাবতো, যুদ্ধের মোড় ঘুরতেই তারা অনেকে ইতিমধ্যে ফ্যুয়েরারের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে মিত্রশক্তির দিকে তাকিয়েছে।

যুদ্ধশেষের তিনমাসে শুধু মাত্র মধ্য ইউরোপেই সৈন্য এবং সাধারণ মানুষ মিলিয়ে হতাহতের সংখ্যা ছিল চল্লিশ লক্ষ। অর্থাৎ হিটলারের দ্বিধাগ্রস্ত মন প্রতিদিন হাজার হাজার লোকের মৃত্যুর জন্য দায়ী। সেই বছরের জানুয়ারী থেকে এপ্রিলের মধ্যে কনসেন্‌ট্রেসন্ ক্যাম্পে পাঁচ লক্ষ লোককে হত্যা করা হয়েছিল। মনে রাখা প্রয়োজন ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসেই সবচেয়ে বড় কনসেন্‌ট্রেসন্ ক্যাম্প আউস্‌ভিজ্ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাকীগুলো বন্ধ হয়েছিল সেই বছরের মার্চ এবং এপ্রিলে। ৩০শে এপ্রিল, ১৯৪৫ সালের বিকেল বেলায় আত্মহত্যা করা পর্যন্ত হিটলার আর বাংকারের ওপরে আসে নি। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে হিটলার বাংকারের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল ১৬ই জানুয়ারী। অর্থাৎ এই একশো পাঁচ দিনে হিটলার আর সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত দেখে নি। যুদ্ধ পরিচালনা, কাজকর্ম, খাওয়া শোওয়া, মিটিং, টি-পার্টি, স্নান এবং সব শেষে বিয়ে পর্যন্ত বাংকারের মধ্যেই করেছে। বাংকারের ভেতরে হিটলারের দিন-রাত নকল আলোর তলাতেই কেটেছে; ধীরে ধীরে সেই আলোর রশ্মিই ওকে বাস্তব জগত থেকে দূরে সরিয়ে কল্পনার জগতে নিয়ে গেছে। শেষে পাড়ি জমিয়েছে অজানা আরেক দেশে।

মাটির তলার বাংকারের প্রথম কয়েকঘণ্টা হিটলার নিশ্চয়ই স্বস্তি বোধ করে নি। এয়ার রেড থেমে গেলে বার কয়েক উঠে এসেছে নতুন রাইখ্ চ্যান্সেলারীতে। এক তলার যে বিরাট মার্বেল টেবিলটাকে ঘিরে সামরিক কনফারেন্স বসতো, খাওয়ার ঘরের যে টেবিলে অপরাহ্নে হিটলার চা খেতো অষ্ট্রিয়ান রাঁধুনী কুমারী কনষ্টানজে মাইজিলের সঙ্গে, সেখানে ঘুরে বেড়ায়। বাংকারে হিটলারের খাওয়ার টেবিলের

সঙ্গী ছিল সেই রাঁধুনী কনষ্টানজে এবং চারজন মহিলা সেক্রেটারী। একেবারে শেষের দিকে ইভা ব্রাউন্।

যতোদুর জানা গেছে, খুব স্বল্প সময়ের জন্য এই সময় হিটলার শহর বার্লিনের বাইরেও গিয়েছিল। ২৫শে ফেব্রুয়ারী সোফিয়ার এস এস কর্নেল এরিখ খেমকা গাড়ী চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল শহরের অনতিদূরে গাউলাইটারদের এক মিটিংয়ে। নাৎসী পার্টির সর্বাধ্যক্ষ এবং দেশের সর্বময় কর্তৃত্ব আমৃত্যু হিটলারের হাতে থাকলেও সম্ভবত এটাই ওর জীবনের শেষ রাজনৈতিক কাজ। আরেকবার বাংকার ছেড়ে বেরিয়েছিল ১৫ই মার্চ। দুপুরবেলা। ভোল্কস ওয়াগন গাড়ীতে। ফ্রাংকফুর্টার অ্যালে ধরে পুবদিকে গিয়েছিল। সেই অঞ্চলে জার্মান শ্রমিকদের বাস। ড্রাইভার খেম্কার মতে। ঘণ্টাচারেক পরে সূর্য্য অস্ত যাওয়ার আগেই ফ্যুয়েরার বাংকারে ফিরে এসেছিল। সঙ্গে ছিল দু'জন সামরিক বাহিনীর লোক।

বাংকারের একঘেয়ে রুটিনে বাঁধা জীবনযাত্রায় মাত্র একদিনই কিছুক্ষণের জন্য ব্যতিক্রম ঘটেছিল। সেই দিনটা হলো ২০শে এপ্রিল; হিটলারের ছাপান্নতম জন্মদিন। শেষ জন্ম দিনের জমায়েতও এটা বটে। শহর বার্লিন তখন একরকম বোমাবিধ্বস্ত। মুহুর্মুহু বোমার আঘাতে কেঁপে উঠছে সারা শহর। চারদিন আগেই রেড আর্মি শহরটাকে প্রায় ঘিরে ফেলেছে। তখন পর্যন্ত হিটলার আইভরি টাওয়ারে বাস করছে। থার্ড রাইখের অপরাজেয় শক্তি মিত্রশক্তিকে দেখাতে উৎসুক হিটলার। ফ্যুয়েরারের এই জন্মদিনে কিছু সংখ্যক বাইরের লোকও উপস্থিত ছিল। ফটোগ্রাফারের দল নিউজ রিলের জন্য তৎপর। বরাবরের মতো এবারেও ওর জন্মদিন পালিত হয় এরেনহোফ বা চ্যান্সেলারীর কোর্ট অফ অনারে। তবে সেই জন্মদিনের পার্টির স্থায়িত্বকাল এক ঘণ্টারও কম ছিল। কোন রকম শ্যাম্পেন পানীয় বিতরণ করা হয়নি। একঘণ্টারও কিছু আগে সামরিক বিভাগে ব্রীফিং করতে হবে বলে জন্মদিনের পার্টি ভেঙে দিয়ে হিটলার বাংকারে ফিরে আসে।

ফ্যায়েরারের জন্মদিনের এই পার্টিটাকে কোনরকম আনন্দ উৎসব বলে মনেই হয় নি। যদিও উপস্থিত সবাই আপ্রাণ চেষ্টা করেছে ফ্যুয়েরারের ক্ষমতার সময়ের জন্মদিনের উৎসবগুলোর মতো নিজেদের দেখাতে ; কিন্তু নিরানন্দ পরিবেশটাই পুরো ব্যাপারটাকে মাটি করে ছেড়েছে। হাইনরিখ্ হিমলার, হারম্যান গোয়েরিং এবং ওর মন্ত্রী-সভার কুড়িজন মন্ত্রীর বেশীর ভাগের সঙ্গেই হিটলারের এটা শেষ সাক্ষাৎ। বার্লিন থেকে হিমলার পালিয়ে চলে যায় উত্তরে, আর গোয়েরিং দক্ষিণে। অন্যান্য মন্ত্রীরাও একে অন্যের পেছনে ছোটে। এই দিনেই কুড়িটা অনাথ ছেলেকে ব্রেসনাউ এবং ড্রেসডেন থেকে আনা হয়। হিটলার ইয়ুথের পোষাক পরে তারা চ্যান্সেলারীর বাগানে সারি দিয়ে দাঁড়ালে হিটলার এগিয়ে গিয়ে তাদের গাল টিপে আদর করে।

মাঝে মধ্যে হিটলার বাংকার থেকে উঠে আসতো। নির্মল হাওয়ায় নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য। সঙ্গে থাকতো ওর অ্যালসেসিয়ান কুকুর, ব্লণ্ডে। ব্যায়াম বলতেও হিটলারের ছিল এই একটাই। কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে বাগানে কিছুক্ষণ পায়চারী করা। অবশ্যই কড়া সামরিক পাহারার মধ্যে। রাতে এই পায়চারী করার পেছনে ছিল একটাই কারণ। হিটলারের চোখের আলো তখন দ্রুত কমে আসছে। প্রায় অন্ধত্বের সামনাসামনি এসে পড়েছে। সূর্যের আলোয় চোখের যন্ত্রণা এড়াতেই হিটলার রাতের বেলা বাংকার ছেড়ে বেরতো।

হিটলার এর আগেও ব্লণ্ডের সঙ্গে একা বেড়াতো। তবে এই দিনগুলোতে অনেক চোখই ওকে পাহারায় রাখতো। কারণ যে-কোন সময় হিটলার নিজের শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে পারে। এমন কি তারজন্য ব্লণ্ডের একটু ধাক্কাই যথেষ্ট। ইদানিং শরীরিক এই ভারসাম্যতা নিয়ে হিটলার নিজেও নিয়মিত অভিযোগ করতো। একটু নজর করলে স্পষ্ট ধরা যেতো যে হিটলার ডানদিকে অনেকখানি ঝুঁকে পড়েছে। ওর দেহরক্ষী যারা বাংকারে থাকতো তাদের অবস্থা

হয়েছিল আরো শোচনীয়। বন্ধ আবহাওয়ায় সিমেন্টের কবরের মধ্যে ওদের নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসতো। মাঝে মাঝে তো এক আধজন মরীয়া হয়ে বলেই ফেলতো যে এরচেয়ে সুর্যের আলোয় আল্পসের নীচে যুদ্ধ করতে করতে মরাও অনেক ভালো। বাংকারের ভেতরের রাত যেন আরো বেশী অসহনীয়। নিস্তব্ধ। একমাত্র ডিজেল জেনারেটারের একটানা গুঞ্জন ধ্বনি। ম্যাড়ম্যাড়ে বিষণ্ণ দেওয়ালগুলো জগদ্দলের মতো বুকের ভেতরে চেপে বসতো। পাবলিক ইউরেনিয়ালে কাজ করার মতোই ব্যাপারটা অস্বস্তিকর।

তারপরেই বাংকারে রীতিমতো নাটক জমে ওঠে। সেই নাটকের কুশীলবরা কেউ কয়েকদিনের জন্য আর কেউ-বা মাত্র কয়েকঘণ্টার জন্য বাংকারে এসেছে। অবশ্য সামরিক কাজকর্মে। তবে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যক্তি ছিল অ্যালবার্ট স্পীয়ার, আর সবার চেয়ে অপ্রয়োজনীয় ছিল জোখাইম্ ভন্ রিবেন ট্রপ।

ইভা ব্রাউন যখন বাংকারে আসে, তখন শহর বার্লিনে যুদ্ধ এসে ভালো মতো পা রেখেছে। টিয়ারগার্টেন অর্থাৎ শহরের সবুজ দ্বীপটুকুতে হতাহতের স্তূপ জমেছে। বাংকারের পাশের গোয়েবেলসের প্রপাগাণ্ডা মিনিস্ট্রির দপ্তর প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। ইভা হিটলারের কয়েকজন সেক্রেটারীর সঙ্গে সেখানেই পিস্তলের নিশানা ঠিক করতে যেতো। বাংকারের মধ্যের অন্যান্য মেয়েদের মতো হিটলারের এই সেক্রেটারীদের বুকও ভয়ে কাঁপতো। যদি হিটলারের মৃত্যুতে কোনক্রমে ওদের প্রাণ বেঁচেও যায়, তবে রেড-আর্মির হাতে পড়লে তারা ওদের চাষার মতো বীভৎসভাবে ধর্ষণ করবে। বাস্তবে কিন্তু ওদের ভাগ্যে ঘটেছিলও তাই। হিটলারের বিশ্বস্ত সহচর বোরম্যান এবং প্রধান দেহরক্ষী মেজর অটো গুইনখে্ দিনে দু'বার বাংকার ছেড়ে উঠে নতুন রাইখ্ চ্যান্সেলারীর ডাইনিং রুমে খেতে আসতো। অবশ্য নতুন রাইখ্ চ্যান্সেলারীর একতলায় ১৬ই এপ্রিল থেকে আর্মি মেস চালু হয়। সিগারেট খাওয়ার জন্য ধূমপায়ীদের বাংকারের বাইরে আসতে হতো। কারণ হিটলার সিগারেট খেতো না। সুতরাং

বাংকারের মধ্যে ধূমপান ছিল নিষিদ্ধ। তবে একথা সত্য যে খুব কম লোকই ফ্যুয়েরারের সঙ্গে বাংকারের ভেতরে রাত্রে শুতো। প্রধান পরিচারক হাইনজ্ লিঙ্গে, হিটলারের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাক্তার থিয়োডর মোরেল, রাঁধুনী কুমারী কন্‌ষ্টানজে মাইজিলে ছাড়া। এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় থেকে ইভা ব্রাউন আসে বাংকারে। ওর ঠাঁই হয় হিটলারের পাশের ছোট্ট একটা ফ্ল্যাটে। পাশেই ব্লণ্ডের থাকার জায়গা। ব্লণ্ডে অবশ্য মার্চ মাস থেকেই হিটলারের সঙ্গে। হাইন্‌জ লিঙ্গে বাংকার ছেড়ে আসে গোয়েবেলস্ পরিবারকে জায়গা করে দেওয়ার জন্য। এদের মধ্যে স্বেচ্ছায় ক'জন থাকতো বলা যায় না। মনে হয় নিতান্ত দায়ে পড়েই এরা হিটলারের সঙ্গে বাংকারের মধ্যে রাত কাটাতে বাধ্য হয়েছিল।

১৬ই জানুয়ারী, ১৯৫৫ সালের দিনগুলোতে ফিরে গেলে দেখা যাবে, বাংকারে বসবাস করার ব্যাপারটাও হিটলার কয়েক ঘণ্টায় ঠিক করেছিল। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে রাতের ট্রেন ধরে হিটলার এসেছিল আড্‌লারহোষ্ট থেকে। আড্‌লারহোষ্ট হলো গোপনীয় কয়েকটা যুদ্ধক্ষেত্রের হেড কোয়ার্টারের মধ্যে একটা। এগুলো ছিল ঈগলের বাসার মতো। শত্রুর অলক্ষ্যে হঠাৎ যেখান থেকে আক্রমণ শানাতো নাৎসীবাহিনী। আড্‌লারহোষ্ট জায়গাটা জিগেনবার্গ থেকে মাইল খানেক উত্তরে বাড নয়্‌হাইমের স্পা শহরের কাছাকাছি। ফ্রাংকফুর্ট অন মেইনের পাশের টাউনুস পার্বত্যাঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত। এখান থেকেই ফ্যুয়েরার পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মান প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টায় ছিল। তুষারঢাকা আরডেনেস্ থেকে বেলজিয়ামের মিউজে নদী পর্যন্ত। যেখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ বন্দর অ্যান্টিওয়ার্প জার্মান নাৎসী বাহিনী হাতের নাগালের মধ্যে পাবে। প্রতিরোধের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ আক্রমণে বিপক্ষকে বিপর্য্যস্ত করার চিন্তায় জন্মজুয়াড়ী হিটলার তখন বাংক ভাঙ্গার আসল তথ্যটাই প্রকাশ্যে ফাঁস করে দিয়ে বসে আছে। আরো বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে জুয়ার টেবিলে যে টাকা হিটলার দ্বিগুণ করার স্বপ্ন দেখছে, আসলে সেই টাকা ওর টেবিলের

বিপরীত দিকে।

আরডেনেসের যুদ্ধের সঙ্গে বার্লিন যুদ্ধের সরাসরি যোগাযোগ ছিল। আরডেনেসের বিপর্যয়স্ততার জন্যই হিটলারকে এতো সত্বর বার্লিনে ফিরে আসতে হয়। ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি। তদানীন্তন চীফ্ অফ্ জেনারেল ষ্টাফ্ কর্নেল জেনারেল হাইনজ্ গুডারিয়ান বারবার হিটলারকে সাবধান করে দিয়েছিল যে দু' দুটো ট্যাংক বাহিনীকে যদি পশ্চিম রণাঙ্গনে আমেরিকান সৈন্যদের অগ্রগতিতে বাধা দেওয়া হয়, তবে পূর্ব রণাঙ্গনে রেড আর্মি একরকম বিনা বাধায় শহর বার্লিনে পৌঁছে যাবে। কারণ, রেড আর্মি তখন ঝটিকা গতিতে ভিস্চুলা থেকে ওডার নদীর দিকে যাত্রা করেছে। আর ওডার নদী হলো শহর বার্লিন থেকে মাত্র ষাট মাইল দূরে। ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি রেড আর্মি ওডার নদীর তীরে পৌঁছে যায়। আর-ডেনেসে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে গিয়ে হিটলার পুবদিকে রেড আর্মিকে বাধা দেওয়ার সামান্য ক্ষমতাটুকুও তখন হারিয়ে ফেলেছে। নইলে রেড আর্মি ওডার বাখে পৌঁছনোর আগেই বাধা দেওয়া উচিত ছিল। কারণ ওডার বাখ জলাভূমি হলেও পুবদিক থেকে শহর বার্লিনে ঢোকার প্রবেশ পথ। হিটলার বার্লিনে আসার সঙ্গে সঙ্গে শহরের ওপরে বোমাবর্ষণের পরিমাণ ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকা বাড়িয়ে দেয়। এর আগে কোলন হামবুর্গ আর ফ্রাংকফুর্টের আকাশেই ওদের চার ইঞ্জিনের বোমারুগুলো ঘোরাফেরা করতো। এবারে ওরা বার্লিনের আকাশে হানা দিতে শুরু করে। মিত্রশক্তির বিশাল সেই বোম্বার বাহিনীতে কখনো কখনো একসঙ্গে দেড় হাজার বোম্বার থাকতো ; দুই তৃতীয়াংশ বোমা শেষের তিন মাসে শহর বার্লিনের ওপরে পড়েছে।

বার্লিনের বাষট্টি ভাগ বাড়ী-ই হয় বিধ্বস্ত, না হয় নিশ্চিহ্ন হয়েছে এই বোমা বর্ষণের দরুণ। শহরতলীর যেখানে বাংকার, সেখানের বাড়ীঘর প্রায় পঁচাশি ভাগই বিধ্বস্ত। পনরো লক্ষ বার্লিনবাসী তখন শহর ছেড়ে ইভাকুয়েট করে গেছে। তবু তিরিশ লক্ষের ওপর বাসিন্দা তখনো শহরের মধ্যে বসবাস করছে। মুষ্টিমেয় কয়েকজনেরই এই

বোমা বর্ষণের সময় আশ্রয় নেওয়ার জন্য গুপ্ত আশ্রয় ছিল। ততোদিনে বার্লিনবাসীদের কাছে এটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভোর সকালে অথবা সন্ধ্যার মুখোমুখিই বোম্বারগুলো বেশ হানা দিতো। আর ওরা জানালা দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে বসে বসে কাঁপতো অথবা পাশের প্রতিবেশীদের যাদের গুপ্ত আস্তানা আছে, সেখানে দৌড় লাগাতো। বেশীর ভাগ বার্লিনবাসীই জানতো না যে হিটলার শহরে ফিরে এসেছে। কারণ, চার্চিল যেমন বোমাবর্ষণে লণ্ডনের অগ্নিকাণ্ডের সময় সারা লণ্ডন চষে বেড়িয়েছে, হিটলার বিধ্বস্ত শহর দেখতে একবারও ওর বাংকার ছেড়ে বেরোয় নি। অবশ্য বার্লিনের এই বিধ্বস্ততার খবর হিটলার কতোখানি রাখতো, তাও সন্দেহের ব্যাপার। কারণ, বাংকারে তো চাহিদা মতো কোন জিনিষেরই অপ্রাচুর্যতা ছিল না। সামনের বিরাট কুয়া থেকে পাইপ বেয়ে জল আসতো বাংকারে। ষাট কিলোওয়াটের ডিজেল জেনারেটর সব সময় বিদ্যুৎ জোগাতো। খাদ্য, পানীয়, ওষুধপত্র, মোমবাতি প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে ষ্টক করা হয়েছিল নতুন চ্যান্সেলারীর গুদামে। প্রয়োজনে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে করিডোর ধরে যা হাজির হ'তো বাংকারের প্যান-ট্রি'তে। প্যান-ট্রি'র নামকরণ করা হয়েছিল খানেন বার্গ অ্যালে। চীফ ষ্টুয়ার্ট আরটুর খানেনবার্গের নাম অনুসারে। সারা জার্মানী থেকে নিয়মিত যোগান আসতো এই সব রসদের ফ্যুয়েরারের জন্য। একমাত্র বাতাসই ছিল শহর বার্লিনের। তাও ফিলটারের মাধ্যমে বাংকারের মধ্যে ঢুকতো।

হিটলার কিন্তু প্রথমে বাংকারে ঢুকতে চায় নি। মাটির ওপরেই থাকতে চেয়েছে। এই বিষয়ে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে পুরুষ হিটলার যথেষ্ট দুঃসাহসী ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধে বীরত্বের জন্য আইরণ ক্রশ পেয়েছিল। হিটলারের ধারণায় ভাগনারিয়ান হীরোরা কখনো বিছানায় শুয়ে মৃত্যুবরণ করে না। তবে হিটলার মৃত্যুর জন্য অধীর ছিল না। অস্থির হয়ে পড়েছিল প্রস্থান দৃশ্যের ব্যাপারে।

এস এস গোয়েন্দা বাহিনীর চীফ্ জেনারেল জোহান রাটেনহুবারের পরামর্শেই হিটলার বাংকারের ভেতরে গিয়ে থাকতে রাজী হয়। অবশ্য যুদ্ধের পরে জানা গেছে যে মিত্রশক্তি বা রাশিয়া কেউ-ই এই বাংকারের কথা জানতো না। শহর বার্লিনের পতনের পরেই ওরা বাংকারটাকে খুঁজে বার করে। আমেরিকান আর বৃটিশ পাইলটরা শহর বার্লিনের বিস্তৃতি দেখে তো অবাক। দুশো চল্লিশ বর্গ মাইল শহরটায় বিরাট বিরাট লেক ছাড়াও সবুজ ঘন বনাঞ্চল রয়েছে। তবে হিটলারের তৈরী করা ইষ্ট ওয়েষ্ট একৃসিস্টা পেয়ে গিয়ে ওদের পক্ষে লক্ষ্য স্থির করা সুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৩৮ সালে হিটলার বিরাট এই রাস্তাটা তৈরী করেছিল। দু'বছর পরে ফ্রান্সের পতন হলে এই রাস্তাতেই ভিক্টরী প্যারেড হয়েছিল। তীরের মতো সরল রাস্তাটা সোজা চলে গেছে ব্রানডেনবুর্গ গেটে। আর এই গেটটা হলো ঠিক শহরের কেন্দ্র বিন্দুতে। এথেন্সের প্রপেলিয়ার ছোট সংস্করণ। প্যারিসের আর্চ দ্য ট্রায়ম্পের থেকে অনেক ক্ষুদ্রকায়। তবে গেটটার অবস্থান এমনই যে আকাশ থেকে স্পষ্ট নজরে আসে। গাড়ী ঘোড়া পুব দিকে এই গেটের মধ্যে দিয়ে গিয়েই তবে পড়ে উন্টার ডেন লিনডেন; বার্লিনের সবচেয়ে সুসজ্জিত বুলেভার্ড। পরে ইষ্ট ওয়েষ্ট একসিস্টাকে বাড়িয়ে উন্টার ডেন লিনডেন পর্যন্ত নিয়ে যায়। পাইলটদের লক্ষ্য স্থির করার আরো দুটো নিশানা ছিল। গেটের পাশেই টিয়ারগার্টেন। পাশ দিয়ে ঝিকমিক করতে করতে বয়ে চলেছে স্প্রী নদীটা। আর অপর নিশানাটা হলো ১৯৩৩ সালে আগুনে পুড়ে যাওয়া রাইখ্স্টাগ। রাইখ্স্টাগের কংকালটা দাঁড়িয়ে থাকলেও এতো বিরাট যে স্প্রী নদীর আর ব্রানডেনবুর্গ গেটের মাঝখানে সহজেই নজরে পড়ে। কামাফ্লেজ করাও সম্ভব হয় নি।

তবে পাইলটদের সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করতো টিয়ারগার্টেনের ঠিক ধারে। ব্রানডেনবুর্গ গেটের দক্ষিণের বিরাট বড় বাড়ীটা। রাইখ্ চ্যান্সেলারী। এই চ্যান্সেলারীর উত্তর দিকে উনটার ডেন লিন্ডেন। এবং পুবে উইলেম ষ্ট্রাসে। পশ্চিম দিকে হারম্যান গোয়েরিং

ষ্ট্রাসে এবং দক্ষিণে ভস্ ষ্ট্রাসে। আকাশ থেকে কিন্তু অ্যালবার্ট স্পীয়ারের ১৯৩৮ সালে তৈরী করা নতুন চ্যান্সেলারীর বাড়ীটা পুরনো চ্যান্সেলারীর থেকে অনেক সহজে দৃষ্টিতে পড়তো। যদিও নতুন চ্যান্সেলারীর কামাফ্লেজ করা ছিল। বিরাট চত্বর ধরে নতুন রাইখ্ চ্যান্সেলারীটা। তবে চওড়ায় কম। উত্তরমুখো। পাশেই ভস্ ষ্ট্রাসে। চারটে বিরাট বিরাট ব্লক একসঙ্গে দাঁড় করালে যেমন হয়, নতুন চ্যান্সেলারী বাড়ীটা অনেকটা দেখতে তেমনি। হঠাৎ দেখলে আর্ট মিউজিয়াম বলে মনে হয়। গোটা বারো বোমা ইতিমধ্যেই চ্যান্সেলারীর ছাদে আঘাত করায় ওপরের দিকের জানালাগুলোর ক্ষতি হলেও বাড়ীটার নীচের দিকে কোন ক্ষতি হয় নি।

নিরাপত্তার খাতিরে যারা বাংকারে যেতো, নতুন চান্সেলারী ভবনের কনট্রোল রুমে তাদের তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করা হ'তো' দিনের বেলায় যারা বাংকারে কাজ করতো, রাত্রে তারা খেতে এবং শুতে আসতো চ্যান্সেলারীর বিরাট বড় বাংকারে। আরেকটা বাংকারও ছিল। সেটাও বিরাট। এস এস গার্ড ব্যারাকের পাশেই। আবার এই বাংকারটাকে ঘিরে ছোট বড় আরো গোটা ছয়েক বাংকার ছিল। মাটির তলা দিয়ে এইসব বাংকারগুলোর মধ্যে পরস্পর যোগাযোগ ছিল। প্রাচীন ক্রিটের কাল্ট অফ্ মিনেয়েচারের পর এই বিশাল বিস্তৃত ল্যাবারিন্থ-ই বোধ হয় তৈরী হয়েছিল।

বাংকারের নিরাপত্তা কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণ করতো নিরাপত্তা রক্ষী বাহিনী। সাধারণ মানুষ বা সৈনিক দূরে থাক, উঁচুর দিকের জেনারেলদেরও তিনটে পৃথক পৃথক চেক পয়েন্ট পেরিয়ে তবে বাংকারে ঢুকতে হ'তো। আর তার জন্য প্রয়োজন পড়তো অনুমতি এবং নিজেদের পরিচয়পত্রের। রাতের বেলা এই নিরাপত্তা দ্বিগুণ করা হ'তো। নিরাপত্তা বাহিনী সদা সর্বদা মেসিন পিস্তল আর হ্যাণ্ড গ্রেনেড নিয়ে তৈরী থাকতো।

শুধু নিরাপত্তার খাতিরেই নয়, জেনারেল রাটেনহুবারের অনুরোধেই হিটলার বাংকারে আশ্রয় নিয়েছিল। ওর ব্যক্তিগত

চিকিৎসকও ততোদিনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। কারণ, শেষের দিকে হিটলারের স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটেছে। আসলে উত্তেজক ওষুধ খেয়ে খেয়ে রাত্রে আর ঘুমোতে পারতো না। তবে বাংকারে এসে সেই সুযোগ কিছুটা মেলে। ১৯৪৩ এবং ১৯৪৪ সালে বোমার শব্দে দু'চোখের পাতা এক করাই ছিল দুষ্কর। বাংকারে সেই প্রচণ্ড শব্দ প্রবেশ পথ পেতো না। একবার শুধু দু'টনের একটা বোমা বাংকারের কাছাকাছি পড়লে সেই ভয়াবহ শব্দে সমস্ত বাংকারটা কেঁপে ওঠে। তবে কোন ক্ষতি হয় নি। কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে, বাংকারের ভিত্তিভূমি হিসেবে পাথর বা মাটিকে ব্যবহার করা হয় নি। বালি শক্ অ্যাবজরভার হিসেবে কাজ করেছে। তবে বাংকারের ঝুলানো বাতিগুলো কিছু সময়ের জন্য যেন প্রচণ্ড ঝড়ে দুলে উঠেছিল।

অবশ্য খতিয়ে দেখতে গেলে দেখা যাবে, বাংকার কিন্তু হিটলারকে সত্যই সুনিদ্রা দেয় নি। শুধু এই আশ্বাস দিয়েছিল বিছানায় শোওয়া অবস্থায় ওর মৃত্যু হবে না। আর সেই কারণেই সম্ভবত ঘণ্টাচারেক নিদ্রা যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব ছিল। হিটলার বিছানায় যেতো রাত চারটে বা পাঁচটায়। আর ঘুম থেকে উঠতো সকাল দশটা এগারোটায়। অবশ্য এই চার পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেও কিছু সময় যেতো পড়াশোনায়। হিটলারের চোখের দৃষ্টি তখন দ্রুত কমে আসছে। ম্যাগনিফাইং গ্লাস ছাড়া ওর পক্ষে কোনরকম পড়াশোনা করাই সম্ভব ছিল না।

পিটার হারম্যানের ভাষায়, আমরা সবাই জানতাম ফ্যুয়েরারের বয়স মাত্র পঞ্চান্ন। আমরা যারা তাকে আগে দেখেছি, তারা এও জানতাম যুদ্ধ পূর্ব বছরগুলোতে মানুষটাকে হিউম্যান ডায়নামো বলা যেতে পারে। অফুরন্ত শক্তির উৎস। ক্লান্তিবিহীন। কিন্তু ১৯৪২ সালের পর থেকেই চিন্তা ভাবনা আর উদ্বিগ্নতায় প্রতি বছরে মানুষটার বয়েস যেন পাঁচ বছর করে বেড়ে চলে। শেষের ছাপান্নতম জন্মদিনে মনে হয় মানুষটার বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে। এতগুলো বছর ধরে

মানুষটা শুধু কাজ করে এসেছে। ওষুধপত্র, স্নায়ু আর মনের ইচ্ছাশক্তির জোরে। কখনো কখনো আবার সেই ইচ্ছাশক্তিতে ভাঁটা পড়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই ইচ্ছাশক্তিকে ফিরিয়ে এনে হিটলার জোর কদমে আবার কাজ শুরু করে দিয়েছে।

এইখানে একটা প্রশ্ন স্বভাবতই এসে পড়ে। বাংকারের এই অস্বাভাবিক জীবনযাত্রা ওর জীবনে কতোটা প্রভাব ফেলেছিল। যৌবনে যখন ওর স্বাস্থ্য খুবই ভালো ছিল, তখনো কিন্তু চরিত্রগতভাবে হিটলার ছিল হাইপোকনড্রিয়াক। যে কারণে যখন জার্মানীর মাটিতে যুদ্ধ পা রাখেনি, তখনো হিটলার ওর খাদ্য, পালস্-বীট, রকমারী ওষুধের পিল, পুরুষত্ব নিয়ে মানসিক অশান্তিতে দিন কাটাতো।

১৯৩৮ সালের প্রথম দিকে হিটলার একটা ব্যাপার নিয়ে অত্যন্ত রকমের উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। ওর পরমায়ু নাকি মাপা। পঞ্চাশ বছর বয়সের মধ্যেই নাকি ওর মৃত্যু ঘটবে। আর এই কারণেই হিটলার যুদ্ধের বছরগুলোকে এগিয়ে নিয়ে আসে। ১৯৩৮ সাল থেকেই হিটলার মন প্রাণ এবং সমস্ত শক্তি যুদ্ধের কাজে বিনিয়োগ করে।

যুদ্ধের সময় হেডকোয়ার্টারগুলোকে মাটির নীচে করার পেছনে হিটলার বরাবর যুক্তি দেখিয়ে এসেছে যে সেখানে নাকি আরো ভালোভাবে ও কাজ করতে পারে। কারণ, মাটির তলার বাতাসে বিষ থাকার সম্ভাবনা নেই। উপরন্তু, দিনের আলো, নির্মল বাতাস আর সকালের প্রহরগুলোতে ও নাকি কাজের ব্যাপারে মন সংযোগ করতে পারে না। শেষরাতই ওর সৃষ্টির পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত সময়।

নিজের ভেঙ্গে পড়া স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করেই হয়তো বা হিটলার মাটির নীচের বাংকারে গিয়েছিল। নার্ভের ব্যাপারে হিটলার বরাবরই ছিল খুঁতখুঁতে। শেষের দিকে সত্যি ওর স্নায়ুতন্ত্র ভেঙ্গে পড়ে।

তবে ফ্যুয়েরারের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে ওর পরিষদবর্গ এবং ডাক্তারদের মধ্যে মতদ্বৈধতার জন্যই সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় না। অনেকেই

বিশ্বাস করতো হাতুড়ে ডাক্তার থিয়োডর মোরেলের অত্যধিক ড্রাগ ব্যবহারের জন্যই হিটলারের স্বাস্থ্যের এতো এবং দ্রুত অবনতি ঘটেছিল। কিন্তু ডাক্তার মোরেল সম্পর্কে হিটলার বরাবরই অত্যন্ত উঁচু ধারণা পোষণ করতো। এবং ডাক্তার হিসেবে ওর সমালোচনা একেবারেই বরদাস্ত করতে পারতো না। ডাক্তার থিয়োডর মোরেল ছাড়াও হিটলারের জীবনের শেষ পনরো দিন আরো চারজন ডাক্তার উপস্থিত ছিল ওর কাছে। ডাক্তার ভারনার হাসে, ডাক্তার আর্নেষ্ট গুন্থার শেনেখ্, ডাক্তার কার্ল গেবহার্ট এবং ডাক্তার লুড্ভিগ্ ষ্টুপফেগার। প্রথমোক্ত তিনজন ছিল চিকিৎসা-শাস্ত্রের অধ্যাপক। ডাক্তার মোরেল বাংকার ছেড়ে যায় ২২শে এপ্রিল। হাসে-ই ছিল হিটলারের প্রথম চিকিৎসক। চ্যান্সেলারীতে ফ্যুয়েরারের চিকিৎসা হাসেই করতো। এবং শেষ চিকিৎসার ভারও পড়েছিল এই হাসেরই ওপরে। তখন অবশ্য ফ্যুয়েরার বাংকারে। হাসে স্বাস্থ্য পরীক্ষার নিমিত্ত রোজই হিটলারের কাছে যেতো। মাঝে মাঝে নতুন চ্যান্সেলারীতে এসে আড্ডা দিতো ডাক্তার প্রফেসার শোনেখের সঙ্গে। শোনেখ্ ওকে ফ্যুয়েরারের ওপর অপারেশন চালাতে বলতো। শোনেখ্ ছিল ইনটারনিষ্ট, দ্রুত হাতে আহত সৈনিকদের ওপর কাটাছেঁড়া করতে ওস্তাদ। তবে ষ্টুমনফেগার ছিল সত্যিকারের সার্জেন। অবশ্য তার বেশীর ভাগ সময় চলে যেতো মার্টিন বোরম্যানের মদ খেতে। বোরম্যানের সঙ্গেই একসাথে ষ্টুম্পফেগারের মৃত্যু হয়। হিটলারের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে ষ্টুম্পফেগারের মতামত পাওয়া যায় না। তবে বাকী তিনজনের ডাইগোনসিস্ তিনরকমের। হাসে স্থির নিশ্চিত ছিল যে হিটলার পারকিনসসন্ রোগে ভুগেছে। যদিও ৩০শে এপ্রিলের আগে হাসে কাছ থেকে হিটলারকে দেখেনি। হাসে এবং শোনেখ্ দু'জনেই সন্দেহ করতো যে ডাক্তার মোরেল হিটলারকে মরফিন ইনজেকসান দিতো। প্রফেসার গেব্হার্ট অবশ্য যুদ্ধের পরে নুরেমবার্গ যুদ্ধ অপরাধী আদালতে যে এফিডেভিট করে তাতে হিটলারের পারকিনসনস্ রোগের কথা স্বীকার করে নি। বরং

চিকিৎসার ব্যাপারে ডাক্তারকেই সমর্থন জানিয়েছে। তবে গেব্‌হার্টের মোরেলকে এই সমর্থনের পেছনে রাজনৈতিক কারণও ছিল।

হিটলারের মৃত্যুর ঘণ্টা চারশেক আগে শোনেখ্‌ ওকে দেখেছিল। ফ্যুয়েরারের স্বাস্থ্য দেখে চমকে ওঠে শোনেখ্‌। পরে বলেছিল,—আমি নিশ্চিত জানি হিটলারের স্বাস্থ্যের যা অবস্থা, তাতে আডলফ্‌ হিটলারের জন্য কোনরকম সেণ্ট হেলেনা অপেক্ষা করে নেই। বড়জোর কিছু সময়ের জন্য এলবে্‌ থাকলেও থাকতে পারে। অবশ্যই যদি বার্লিনের এই কবর থেকে কোনরকমে বেরতে পারে। জীবিত এই মানুষটা প্রায় কংকালে পরিণত হয়েছে। এক, দুই বা বড় জোর তিনটে বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে, তার বেশী কিছুতেই নয়। হিটলার নিজেও সম্ভবতঃ এটা উপলব্ধি করতে পেরেছিল। কারণ, শোনেখের সঙ্গে হিটলারের যখন দেখা হয়, তার আগেই হিটলার আত্মহত্যার জন্য মনস্থির করে ফেলেছে।

হিটলারের অতীতের আইস্‌বার্গ নীলরঙা জ্বলন্ত চোখদুটো বর্তমানে কোটরে ঢুকে গেছে, দৃষ্টি স্বচ্ছ নয়। রক্তাভ। বাদামী রঙের চুলগুলো হঠাৎ সাদা হয়ে গেছে। আগের মতো সোজা হয়ে দাঁড়ানোর ভঙ্গী আর নেই। হাঁটাটাও কেমন যেন বেখাপ্পা। একটা পা টেনে চলে। মাথা সামনের দিকে বেশ কিছুটা নুইয়ে, শরীরটা ঝুঁকে। প্রায়ই শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে না। দুটো হাতই অনবরত কাঁপে। ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতটাকে শরীরের সঙ্গে চেপে ধরে রাখতে হয়। ডিভানে শোয়ার সময় পরিচারক লিঙ্গে মাটির থেকে ওর পা দুটোকে ডিভানে তুলে দেয়। কথাবার্তার সময় কাঁপা ঠোঁট দিয়ে অনবরত থুতু ছোটে। একদা নিদাগ ইউনিফর্মে এখন এখানে ওখানে থুতুর দাগ ছড়ানো ছিটানো। কম্পমান দাঁতের ফাঁক দিয়ে সদাসর্বদা শিষের মতো একটা শব্দ বেরোয়।

১৯৩৯ সালে অ্যালবার্ট স্পীয়ার ফ্যুয়েরারের পঞ্চাশতম জন্মদিনে শহর বার্লিনের চল্লিশ ফুট লম্বা একটা কাঠের মডেল তৈরী করে উপহার দিয়েছিল। তখন ঠিক হয়ে গিয়েছিল বার্লিন নাম বদলে

দিয়ে শহরটার নতুন নামকরণ করা হবে জারমানিয়া। শহরটার পরিকল্পনা করা হয়েছিল এমনভাবে যাতে এক কোটি লোক স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে তাতে। বিরাট একটা রাস্তার পরিকল্পনাও তা'তে জুড়ে দেওয়া হয়। প্রাখ্‌ট ষ্ট্রাসে বা ষ্ট্রীট অফ্‌ স্প্লেনড়ার। রাস্তার ওপরে থাকবে অনেকগুলো বিজয় গেট্‌। একটা সুপারডোম বা কুফারহালে। রোমের সেন্টপিটারের থেকে সাতগুণ বড়। আর একটা রাইখ্‌ চ্যান্সেলারী অবশ্যই থাকবে এই বিশাল শহরে। সেই চ্যান্সেলারীর নামকরণ করা হবে ফ্যুয়েরার প্যালেষ্টা বা হিটলারের প্রাসাদ। ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসেও মডেলটা ব্রানডেনবুর্গ গেটের কাছের আকাদেমী অফ্‌ আর্টসে ছিল। বাংকারের থেকে এই আকাদেমীতে যাওয়ার জন্য গোপন পথ থাকলেও হিটলার কখনো এই আকাদেমী পরিদর্শনে আসেনি। বাংকারের মধ্যেই ওর প্রিয় শহর লিনৎজের ছোট একটা কাঠের মডেল ছিল।

বাংকারে থাকার মধ্যে ছিল একটা সুইচবোর্ড, একটা রেডিও আর একটা রেডিও-টেলিফোন। যার দ্বারা হিটলার, জার্মান সুপ্রিম কমাণ্ড, আর্মড ফোর্সের সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ রাখতো। টেলিফোনটা নির্ভর করতো দোদুল্যমান একটা অ্যান্টেনার ওপরে। মাসুয়ারেন অ্যালের বার্লিন রেডিও বিল্ডিংয়ের ওপরে অ্যালুমিনিয়ামের বেলুনের সাহায্যে ঝুলিয়ে রাখা হ'তো। আগে হিটলারের টেলিফোন ব্যবস্থা ছিল মাকড়সার জালের মতো ইলেকট্রনিক নেট ওয়ার্কের মাধ্যমে। সারা ইউরোপ জুড়ে যোগাযোগ রাখা হতো। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হিটলার জার্মান সেনাবাহিনীর কমাণ্ডে ছিল।

যুদ্ধের ছ'টা বছরে হিটলার এক হেড কোয়ার্টার থেকে আরেক হেড কোয়ার্টারে ক্রমাগত ঘুরে বেড়িয়েছে। যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী। তবে যেখানেই ফ্যুয়েরার গেছে, একটা জিনিষ ভারী বাক্‌সে পুরে সঙ্গে নিয়ে যেতে ভোলে নি। তা হলো ফ্রেডরিখ্‌ দ্য গ্রেটের একটা অয়েল পেন্টিং ছবি। ১৯৩৪ সালে মিউনিকে কিনেছিল হিটলার ছবিটাকে। যত্নের সঙ্গে ছবিটাকে যেন নাড়াচাড়া

করা হয়, হিটলারের সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর ছিল। বাংকারের করিডরে টাঙানো ছিল ছবিটা। জীবনের শেষ পর্বে দেওয়াল সাজানো ছিল একমাত্র এই ছবিটা দিয়েই।

অনেক সময় দেখা যেতো ফ্যুয়েরার একা একাগ্র দৃষ্টিতে ফ্রেডরিখ্ দ্য গ্রেটের ছবিটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। অল্প বয়েসী সৈনিক পরিচারক মিস্থুখ বাংকারের জীবন ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতো। একবার একটা জিনিষ আনতে হিটলারের ষ্টাডিতে ঢুকেছিল। ওর ধারণায় হিটলার নিশ্চয়ই তখন বিছানায়। কিন্তু ষ্টাডিতে ঢুকে দেখে নিশ্চল ভঙ্গীতে হিটলার বসে। একদৃষ্টিতে ফ্রেডরিখের ছবিটার দিকে তাকিয়ে। যেন মেডিটেসানে বসেছে। মিস্থুখে্র অবস্থা তো তখন কাহিল। অবশ্য হিটলারের ধ্যানভঙ্গ হয় নি দেখে কোনরকমে ষ্টাডি থেকে পালিয়ে আসে।

ফ্রেডরিখ্ দ্য গ্রেটের ট্রাডিসান থেকে হিটলার সম্ভবত উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল অয়েল পেন্টিং ছাড়া বার্লিনের গোর্টের কাছের অস্বাভাবিক পরিবেশ। তবে ১৭৬৩ সালের প্রথমদিকের সেই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির হাত থেকে ফ্রেডরিখ্ রক্ষা পেয়েছিল কারণ সম্মিলিত অপরপক্ষ অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া এবং সাস্কেনদের মধ্যে তখন ঝগড়া বেধে গিয়েছিল। কিন্তু প্রুশিয়ার রাজার ভাগ্য হিটলারের ছিল না। ১৬ই জানুয়ারী ১৯৪৫ সালে বার্লিনে যখন হিটলার ফিরে আসে, মিত্র শক্তির নেতারা তখন ইয়ালটায় জোট বাঁধছে। যুদ্ধের সত্বর সমাপ্তি ঘটাবার জন্য। প্রেসিডেন্ট ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট এসেছে ক্রুজারে এবং প্লেনে। আর প্রিমিয়ার ষ্টালিন ট্রেনে এসে হাজির হয়েছে কৃষ্ণ সাগরের তীরে স্বাস্থ্য উদ্ধারকেন্দ্র শহর ক্রিমিয়াতে। তিন শক্তির এই গোপন মিলনের নাম ছিল আরগোনাউট। গোল্ডেন ফিজে্র সাহসী সমস্ত নাবিকদের নামকরণে। হিটলার গোপন সূত্র থেকে ত্রয়ীর এই সম্মিলিত বৈঠকের খবর পেয়ে রাগে গজরাতে থাকে। কারণ ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ক্রিমিয়া পেনসুলিয়া জার্মানদের হাতেই ছিল। মাত্র ন' মাস আগে জার্মান সেনা বাহিনী

ক্রিমিয়া থেকে ইভাকুয়েট করেছে। যদি ফ্যুয়েরারের পরিকল্পনা মতো যুদ্ধ চলতো, তবে ক্রিমিয়াই হয়তো বা জার্মান সেনাবাহিনীর পরবর্তী হেড কোয়ার্টার হ'তো।

॥ দুই ॥

শেষ পর্যন্ত বার্লিন বাংকারই জার্মান্ সেনাবাহিনীর হেড কোয়ার্টার হয়ে দাঁড়ায়। এই বাংকার থেকেই আডলফ্ হিটলার যুদ্ধের সমস্ত বিভাগ পরিচালনা করতো।

ভাবতে অবাক লাগে যে অতীতে হিটলার খুব কমই শহর বার্লিনে এসেছে। ১৯৪১ সালের পর তো একনাগাড়ে কখনোই বার্লিনে থাকে নি। রাইখের রাজধানীতে কখনো কখনো পরিদর্শনে এসেছে মাত্র। ১৯৪২ সালে প্রায় পুরো গ্রীষ্মকালটাই হিটলার জার্মানীর বাইরে ছিল। একেবারে উক্রাইনের ভেতর দিকে। ১৯৪৩ এবং ১৯৪৪ সালের বেশীর ভাগ সময় হিটলারের কেটেছে ইষ্ট প্রুশিয়াতে। ইতিহাস এবং ভূগোলের দিক থেকে দেখতে গেলে ইষ্ট প্রুশিয়াই ছিল রাইখ্ সাম্রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশ। ইষ্ট প্রুশিয়ার লেক অঞ্চল রাস্টেনবুর্গ মিউনিক থেকে দূরে কিন্তু লেনিনগ্রাদের গা ঘেঁষা ছিল যুদ্ধরত একটা জাতিকে হিটলার মিউনিসিপ্যাল ড্রেনের থেকে প্রায় কুড়ি ফুট. মাটির নীচে থেকে পরিচালনা করতো।

তবে জীবন ধারায় কিন্তু হিটলারের বৈচিত্র্য তেমন কিছু ছিল না। কারণ, এটা ছিল ওর ত্রয়োদশতম বাংকার—হেডকোয়ার্টার। আর সব বাংকারগুলোই ছিল বিশাল; তার মধ্যে আধডজনই মাটির তলায়। ফ্যুয়েরারের অধীনস্থ কর্মচারীরা পেছনে এই জীবন যাত্রা

সম্পর্কে অসন্তুষ্ট হলেও মোটামুটি নিস্তব্ধ এই পরিবেশে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছিল। হিটলারের প্রাইভেট সেক্রেটারী কুমারী ক্রিস্টা শ্রোয়েডর ১৯৪০ সালেই ফেলস্ নেস্ট বা পাহাড়ের বাসা সম্পর্কে অভিযোগ করেছিল। ওখানকার নিস্তব্ধতা নাকি অসহ্য। হিটলার তখন বাসা বেঁধেছে আইফেল পর্বতমালায়। এখান থেকে হিটলার নীচের দেশগুলো এবং ফ্রান্সের ওপরে ব্লীৎসক্রীগ্ বা ঝটিকা যুদ্ধ পরিচালনা করেছে। ফেলস্ নেস্টই হলো হিটলারের প্রথম মাটির নীচে অবস্থানের কেন্দ্র বা হেড কোয়ার্টার। আর বার্লিন বাংকার ওর জীবনের শেষ মাটির তলায় লুকনো হেড কোয়ার্টার।

যুদ্ধের শেষ পর্বে হিটলার যখন বার্লিনে আসে, তখন হয়তো বা উপলব্ধি করতে পেরেছিল যুদ্ধে জার্মানী একেবারে কোণ ঠাসা হয়ে পড়েছে। ওরও করার মতো অবশিষ্ট কিছু নেই। অবশ্য এর আগে অন্য হেড কোয়ার্টারগুলো থেকেও হিটলার বার্লিনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলতো। যেমন বার্লিনের চারশো মাইল উত্তর পশ্চিমে ছিল রাস্টেনবুর্গ। গভীর পাইন বনের ভেতরে। এখানের বাংকারের মধ্যে কর্নেল ষ্টুফেনবুর্গ ওকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছিল। ষ্টুফেনবুর্গ বুঝেছিল যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপরেই হিটলারের শক্তি নির্ভরশীল। কিন্তু সেই যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিকল করতে না পারায় বার্লিনের বিদ্রোহ সফল হ'তে পারে নি। হিটলার যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে বার্লিনের সেই বিদ্রোহ দমন করে দিয়েছিল। ষ্টুফেন-বুর্গের সহবিদ্রোহীরা কিন্তু প্যারিসে সফল হয়েছিল। ২০শে জুলাই তারা এস এস, গেষ্টাপো এবং নাৎসী অফিসারদের নিরস্ত্র করে হোটেল কন্টিনেন্টালে বন্দী করে ফেলে; প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা ওরা বন্দী থাকে। যদি ষ্টুফেনবুর্গের বার্লিনের সহকর্মীরা প্যারিসের মতো সক্রিয় হ'তো, তবে বাংকারের মধ্যের হিটলারকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা মোটেই কঠিন কাজ ছিল না। বার্লিন বাংকারের রেডিও বা টেলিফোন কিছুই কাজ করতো না। আসলে বাংকারের যোগাযোগ ব্যবস্থা কখনোই তেমন উন্নত ছিল না। কারণ বাংকার যারা তৈরী করেছিল, তারা

এর প্রয়োজনও বোধ করেনি। প্রথমত, হিটলারের শহর বার্লিনের প্রতি অনীহা। দ্বিতীয়ত, বার্লিন শহরের পনেরো মাইল দক্ষিণে জোসেন। যেখানে পাঁচশো এ ম টি'র সেন্ট্রাল বোর্ড। ওরা ভেবেছিল তেমন প্রয়োজন পড়লে একটা গ্রিডের সাহায্যে বাংকারের সঙ্গে এই সেন্ট্রাল বোর্ডের যোগাযোগ করে দিলেই চলবে। এই সেন্ট্রাল বোর্ডের মিলিটারী কোড নাম ছিল জেপলিন। এ ম টি পাঁচশোব সঙ্গে ইলেকট্রনিক নেট ওয়ার্কের সাহায্য আর্মি। নেভী এবং এয়ারফোর্সের সরাসরি যোগসূত্র ছিল। সেন্ট্রাল পাঁচশোর অবস্থান ছিল বিরাট একটা বাংকারের মধ্যে। হিটলারের বাংকারের চেয়ে এই বাংকারটা প্রায় সাতগুণ বড় এবং চল্লিশফুট মাটির নীচে। ১৯৩৯ সাল থেকেই এই সেন্ট্রাল বোর্ড সক্রিয়। তবে ভাগ্যের পরিহাসই বলতে হবে যে কেউই ভাবে নি হিটলার একদিন এই বাংকারের মধ্যে এসে আশ্রয় নেবে। তাই সেন্ট্রাল বোর্ডের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ছিল নতুন চ্যান্সেলারী ভবনের। বাংকারের সঙ্গে নয়। আসলে শহর বার্লিনকে বরাবরই হিটলারের না পসন্দ। কিন্তু যুদ্ধের গতিপথ দেখে হয়তো বা হিটলার ভেবেছিল মরতে হলে অখ্যাতনামা রাস্টেন বুর্গ ইত্যাদিতে না মরে, শহর বার্লিনে মৃত্যুটাই সঙ্গত হবে। তাই শহর বার্লিনকেই জীবনের শেষ দিনগুলোর জন্য বেছে নিয়েছিল। হিটলার। আর এতো তাড়াতাড়িতে যোগাযোগ ব্যবস্থা কেউ করে উঠতে পারে নি। কারণ জোসেনও ছোট জায়গা। অখ্যাতনামা। অন্তত হিটলারের মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষী পুরুষের কাছে তাড়াহুড়োতে বাংকারটাকে হিটলারের বসবাসের উপযোগী করে তুলতে হয় বলে, চার দিকেই সমস্যা দেখা দেয়। ১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসে সিকিউরিটি গার্ডের ঘরেই একটা আধুনিক সুইচবোর্ড টাঙানো হয়। সঙ্গে ক্রাম্‌লিং ডিভাইস্। যার দ্বারা হিটলার মিউনিক, ব্রাখ্‌টেস্ গাডেন এবং গোপনীয় সামরিক সংবাদ আদান প্রদান করতে পারে। কিন্তু সুইচবোর্ডটা বড় না থাকায় একজন অপারেটার দিয়ে যেন কাজ চালাতে পারে এমনভাবে ডিজাইন করেছিল বার্লিনের সীমেন্স

কোম্পানি। সুইচবোর্ডটা ডিভিসানাল মিলিটারী হেডকোয়ার্টার বা মাঝামাঝি গোছের হোটেলের কাজ চালাবার উপযুক্ত। তাও শান্তির সময়ে। যুদ্ধের ঝড়ের মধ্যে নয়। অপারেটার রিলে লিংকের সাহায্যে সেণ্ট্রাল ছ'শোর মাধ্যমে তবে সেণ্ট্রাল পাঁচশোতে পৌঁছতে পারতো। এই সেণ্ট্রাল ছশো ছিল লম্বা ক্লাক্ টাওয়ারে। জু রেলরোড ষ্টেশনের পাশে। বার্লিন বাংকার থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে।

এই সুইচবোর্ডের অপারেটরও ছিল অপেশাদারী সার্জেন্ট রলুস মিস্থুখ্। এই ধরণের সুইচবোর্ড চালাবার কাজ মিস্থুখ্ ব্রাখটেস গাডেনে শিখেছিল। হিটলারের শেষ পনেরো দিন বার্লিনের মিউনিসিপ্যাল টেলিফোনও বিকল হয়ে পড়ে। তখন ষ্টাফরা বাধ্য হয়ে এই সুইচবোর্ডের মাধ্যমেই শহরাঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বন্ধুদের কাছে খবরাখবর নিতো, রেড আর্মি কতো দূরে। ওদের সঙ্গে কটা ট্যাংক আছে, ইত্যাদি।

অনেক নীচু পদের সৈনিকের সঙ্গে সার্জেন্ট মিস্থুখ্ও বাংকারের মধ্যে আটকা পড়ে। কিন্তু শহর বার্লিনে কী ঘটছে তা' নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ছিল মিস্থুখ্। ১৬ই এপ্রিল অপারেসন ক্লজ্‌ভিজ্ সুরু হওয়ার আগে মিস্থুখ্ বৌয়ের সঙ্গে কার্লসহাষ্টে ছোট্ট একটা ভাড়া বাড়ীতে থাকতো। পুর্বদিকের বার্লিনের এই সহরতলীটাই প্রথম লাল ফৌজের হাতে পড়ে। ১৯৪৩ সালে মিস্থুখের বিয়ের দিন আডলফ্ ওকে পঞ্চাশটা পুরানো রাইখ্ ওয়াইনের বোতল উপহার হিসেবে দিয়েছিল। এবং যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভাঁড়ারে রেখে দেওয়ার নির্দেশ ছিল। মিস্থুখ্' ওর বাগানের কোণে ক্র্যাটসুদ্ধ মদের বোতলগুলো পুঁতে রেখেছিল। বাংকারের ডিউটি ছেড়ে যাওয়ারও উপায় নেই। সুতরাং মদের বোতল টোতল ভুলে গিয়ে বৌকে কয়েক মাসের পুত্র সন্তান সহ তার বাবার কাছে চলে যেতে বলে। শহর বার্লিনের দক্ষিণে। রুডাউতে। ওখানে ওর বাবার ছোট্ট একটা বাগানবাড়ী ছিল।

বাংকার' থেকে রুডাউ প্রায় দশ মাইল দূরে। আপ্রাণ চেষ্টা করেও মিস্থুখ্ টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পারে না বৌয়ের সঙ্গে

যোগাযোগের জন্য অস্থির হয়ে পড়ে মিস্থখ্। পাশের খাটে নিরাপত্তা প্রহরীরা নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। সুইচবোর্ডটাকে নাড়তে চাড়তে গিয়ে মিস্থখ্ দেখে মিউনিক এবং ব্রাখ্টেস্গাডেনের সঙ্গে সহজেই টেলিফোন যোগাযোগ হ'তে পারে। মিস্থখ্ মিউনিকের বন্ধু বান্ধবের যখন ওর সমস্যার কথা বলছে, মিউনিকের সুউচবোর্ডের অপারেটার হয়তো বা বুঝতে পারে নি যে ও ফ্যুয়েরারের বাংকার থেকে কথা বলছে। ওর কথা শুনে মিউনিকের সেই অপারেটার ওকে মুহূর্তে রুডাউয়ের টেলিফোন কানেকসান দিয়ে দেয়।

মিস্থখ্ বৌকে লাইনে পেয়ে জানতে পারে যে কিছুক্ষণ আগে এর শ্বশুরমশাই এয়ার রেডের সময় ছুটে আশ্রয় নিতে গিয়ে স্পিল্টা-রের আঘাতে মারা গেছে। টেলিফোনেই বৌয়ের কান্না শুনতে পায়। মিস্থখ্ ওকে সান্ত্বনা দেয় যে কয়েক দিনের মধ্যেই ওর সঙ্গে মিস্থখ্ মিলিত হবে। কিন্তু রাশিয়ানদের হাতে বন্দী হওয়ার ফলে এই মিলন হ'তে ওদের দশ বছর লেগেছিল।

মিস্থখে্র ঘরের মধ্যেই ছিল আরেকটা সুইচবোর্ড। মিডিয়াম এবং লঙ ওয়েব রেডিও ট্রানস্মিটার। তবে এই রেডিও ট্রানস্মিটারের সর্ট ওয়েব ছিল না। এই রেডিও থেকে ট্রানস্মিসানের জন্য অ্যান-টোনার প্রয়োজন। তড়িঘড়িতে একটা অ্যানটোনা কোনরকমে বাংকারের ওপরে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কামানের গোলাতে দু' দুবার অ্যান-টোনাটা ভেঙ্গে পড়ে। সেই গোলার আগুনে সুইচ্ বোর্ডও যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২৭শে এপ্রিল শুক্রবার থেকে সুইচ-বোর্ডটা বিকল হয়ে যায়।

ভাগ্যের পরিহাসই বলতে হবে; হিটলারের জীবনের শেষ ক'দিন বি বি সির সংবাদ হানস্ বাওয়ার নামে একজন সম্পাদনা করে ফ্যুয়েরারের কাছে পাঠাতো। এই বি বি সি'র মাধ্যমেই হিটলার জানতে পারে যে হাইনরিখ্ হিমলার বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

হিটলার এ্যারোষ্টক্র্যাট্দের প্রতি বরাবরই মনের ভেতরে এক গভীর বিদ্বেষ পোষণ করতো। যার জন্য ওদের স্থাপত্যকলাকেও পছন্দ

করতো না। ওর ধারণায় এই স্থাপত্য শুধু ওদেরই বসবাসের জন্য। দুর্গ, প্রাসাদ এবং কানট্রি-হাউসগুলো এইজন্যই হিটলারের ভালো লাগতো না। খুব কমই এই সবের ভেতরে ঢুকতো হিটলার। সেই কারণেই আড্‌লার হোষ্ট বা ঈগলের বাসা ওর মাথা থেকে বেরোয়। ভবিষ্যতে যা নাকি ফ্যুয়েরার হেড কোয়ার্টার হয়। স্পীয়ারই এই আড্‌লারাহোষ্টের নক্‌সা তৈরী করেছিল। হ্যাঁ, হিটলারের জন্য।

স্পীয়ারের ভাষায়, ১৯৩৯ সালের গ্রীষ্মকালে যুদ্ধ সুরু হওয়ার ঠিক আগে, হিটলার আমাকে মেইন নদীর কাছে ফ্রাংকফোর্টের ধারে পাশে হেড কোয়ার্টার তৈরীর জন্য জায়গা খোঁজার নির্দেশ দেয়। যৌবনে হিচ হাইকিং কম করি নি। তাই টাউনুস পর্বতমালা, চারপাশের পাহাড়গুলো এবং বাড নয়িহাইমের মাইল সাতেক দূরের জিগেনবুর্গ সম্পর্ক ধ্যান ধারণা আমার খুব ভালোই ছিল। যৌবনে গ্যেটে জীবনের অনেকগুলো অলস প্রহর এইসব অঞ্চলে কাটিয়েছে। জিগেনবুর্গের মাইলখানেক উত্তরে, সবুজ ঘাসে ঢাকা প্রান্তরের মধ্যে আমরা একটা কানট্রি-হাউস খুঁজে বার করি। কামাফ্লেজ করার পক্ষে বাড়ীটা চমৎকার। বিরাট বাড়ী, আস্তাবল এবং বিশাল উঠোন নিয়ে সুন্দর বাড়ীটা; হিটলারের পছন্দ ততোদিনে বুঝে গেছি। আমরা বাড়ীটাকে ঢেলে সাজাই। যাতে বাখ্‌টেস গাডেনের কিছুটা আরাম অন্তত এখানেও হিটলার পেতে পারে। সামরিক বিভাগের লোকজনের থাকার ব্যবস্থা করি জিগেনবুর্গ এবং তার চারপাশ ঘেরা গ্রামগুলোয়। বাড নয়িহাইমের কাছের শহর স্পাতে। সত্যি বলতে কি, এই অঞ্চলটাকে বাছার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ ছিল হঠাৎ এদিকে কারো নজরে পড়বে না। সাদামাটা জায়গাটা কাউকেই আকর্ষণ করবে না। এমন কি আকাশ থেকেও নজরে পড়ার সম্ভাবনা কম। আর সামরিক যন্ত্রপাতিগুলো ছিল মাটির নীচে। ওপরের সবুজ মাঠে গরুকে চরতে দেখে হয়তো বা কারোরই,

পোল্যাণ্ডে প্রচার শেষ করে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে হিটলার বার্লিনে ফিরে এলে তাকে নতুন পশ্চিমাঞ্চলের হেড কোয়ার্টার দেখাতে নিয়ে আসি। আমার অবস্থাটা সহজেই অনুমেয়। হিটলার কিন্তু একটা রাতও এখানে থাকতে চায় না। গজরাতে থাকে। চরম বিলাসবহুল, কিন্তু গৌরবময় নয় এই হেডকোয়ার্টারটা। যা নাকি ওর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। ওর মতে, এটা হর্স লাভিং এ্যারোষ্টক্র্যাটদের পক্ষে ভালো। কিন্তু যুদ্ধের সময় ওর জীবনযাত্রা এমন সহজ সরল হওয়া উচিত যাতে সাধারণ সৈনিকরা পর্যন্ত অনুপ্রেরণা পেতে পারে। তাই ফ্যুয়েরারের জন্য তৈরী করা এই হেড কোয়ার্টারটা পশ্চিমাঞ্চলের কমাণ্ডার-ইন-চীফ ফিল্ড্ মার্শাল গার্ড ভন রুনসৃষ্টাডকে দেওয়া হয়। হিটলার ওর জন্য সাদামাটা একটা হেড কোয়ার্টার তৈরীর নির্দেশ দেয়। ডরিক আইফেল পর্বতমালায়। নিখুঁতভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, ফ্যুয়েরারের নির্দেশ ছিল হেড কোয়ার্টারটা হবে পর্বতের একটা গুহার মতো।

হিটলারের এই সহজ সরলজীবনযাত্রার ইচ্ছেটা কিন্তু আমার কাছে বজ্রাঘাতের মতো ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। একে তো আরও কুড়ি লক্ষ ডলারের ধাক্কা। ইলেট্রিক্যাল দুই প্রস্থ যন্ত্রপাতি; মাইলের পর মাইল বিদ্যুতের তার যাওয়া ইত্যাদি সবকিছুই শেষ করতে হবে বিদ্যুৎ গতিতে। কারণ ১৯৩৯ সালের অক্টোবর নবেম্বরে হিটলার পশ্চিমাঞ্চলে বিরাট আক্রমণ করার স্বপ্ন দেখছে তখন।

১৯৩৯ সালের শরৎকালে পশ্চিমাঞ্চলে আরো দুটো ফ্যুয়েরার হেড কোয়ার্টার নির্মাণ করা হয়। প্রথমটা রোডার্টের পাহাড়ের গায়ে। মিউনিষ্টার আইফেল থেকে মাইল দশেক দূরে; বেলজিয়াম সীমান্তে। এটা ছিল ফেলস্ নেসষ্ট বা পাহাড়ের বাসা। বাদুড়ভর্তি প্রাকৃতিক গুহা এটা। নবেম্বর মাসের কুয়াসা ভেজা গুহার দেওয়াল। চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল মেজেতে পড়তো। সারা আইফেল পর্বতমালাকে কাঁপিয়ে শিষ টানতে টানতে আসতো ঝোড়ো বাতাস। সেইবার শরৎ কালে হিটলার মাত্র কয়েক সপ্তাহ কাটিয়েছিল। এই ফেলস্ নেসষ্টে।

বাকী শীত ওর কাটে বার্লিন এবং ব্রাখ্‌টেস্‌ গাডেনে। আবার বড়সড় আক্রমণের জন্য এই ফেলস্‌ নেস্‌ষ্টে হিটলার ফিরে এসেছিল বসন্তকালে পশ্চিমদিকেই আরেকটা বিরাট বড় ফ্যুয়েরার হেড কোয়ার্টার ছিল। ১৯৩৯ সালে একই সময়ে তৈরী হলেও হিটলার এখানে এসে থাকে নি। বা ব্যবহার করে নি। তবে পরিদর্শন করেছিল। ব্ল্যাক ফরেষ্টে নিবিস্‌ পাহাড়ের নীচে। ফ্রয়িডেনষ্টাড শহরের পশ্চিমে। বাদেনের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে জুড়ে ছিল ব্ল্যাক ফরেষ্ট। রাইন পেরোলেই ফরাসী সীমান্ত। জার্মানীর অপ্রতিরোধ্য ম্যাজিনো লাইনও ছিল এইখানে। তবে মিত্রপক্ষ প্রায় দু'শো মাইল ঘুরে ষ্ট্রাসবুর্গের কাছে সেডান দিয়ে প্রবেশ করে ম্যাজিনো লাইনকে অকেজো করে দেয়।

আরেকটা বিশাল বাংকার তৈরী করা হয়েছিল ওবারসাল্‌জ্‌বুর্গ পাহাড়ের নীচে; বাখ্‌টেস্‌গাডেনে। নীচের শান্ত উপত্যকা থেকে শুধু পাহাড়ের চূড়াটাকেই দেখা যেতো। হিটলারের প্রাইভেট সেক্রেটারী মার্টিন বোরম্যানের নির্দেশে প্রায় সমস্ত পাহাড় খুঁড়ে বাংকার আর যন্ত্রপাতি রাখার ব্যবস্থা হয়। আশেপাশের পাহাড় গুলোতে বোরম্যান, গ্যোয়েরিং, হিটলার ইত্যাদি সব চাঁইদের বাড়ী তৈরী করা হয়। প্রতিটি বাড়ীর সঙ্গে ছিল মাটির তলায় আত্ম-গোপন করা বাংকার। যুদ্ধের সময় প্রয়োজন হতে পারে ভেবে। ১৯৪০ সালের এপ্রিল মে মাসে জার্মান বাহিনী পোল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সে বিরাট করে আক্রমণ সুরু করলে হিটলার আইফেল পাহাড়ের ফেলস্‌ নেসষ্টে চলে যায়। ব্যাপারগুলো এতো দ্রুত লয়ে ঘটে চলছিল যে মে মাসেই হিটলার ফরাসী সীমান্তের কাছাকাছি ব্রুলি-দ্য-পেচে, সেডানের পেছনের ছোট্ট একটা বেলজিয়ামের গ্রামে আসে। এখান থেকেই প্লেনে উড়ে ২৬শে জুন ভোরে সকালে প্যারিসে গিয়ে হাজির হয় হিটলার।

১৯৪০ সালের গ্রীষ্মকালে পাকাপাকিভাবে আরো একটা বাঙ্কার তৈরী করা হয়েছিল। ফ্যুয়েরারের ব্যবহারের জন্য। সসিয়ানের উত্তরে মারগিভেলে। বেশ কিছুটা মাটির নীচে

ছিল এখান থেকে অপারেশন সী-লায়ন পরিচালনা করার। এই অপারেশন সী-লায়নই হলো জার্মান সেনাবাহিনীর ইংল্যাণ্ড আক্রমণের পরিকল্পনা। যদি লণ্ডনের পথে ওর সেনাবাহিনী ডোভারে হাজির হয়, তার জন্য ক্যালের ওপরে চাক্ ক্লিপস্ পাহাড়ে আরো একটা বাংকার তৈরী করিয়েছিল হিটলার। বলাবাহুল্য, আজও ফরাসীরা সেই বাংকার ব্যবহার করছে। ছত্রাক চাষের জন্য।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরের পোল্যাণ্ডের মতোই ১৯৪১ সালের বসন্তে হিটলারকে আবার ট্রেনে চড়তে হয়। মুসোলিনির সেনাবাহিনী তখন গ্রীসে আটকা পড়েছে; হিটলারকে যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে দিয়ে বাধ্য হয়ে সাহায্য পাঠাতে হয়। মানিখ্ কিরখেন। অষ্ট্রীয়ার থেকে রেললাইনটাকে ভিনার নয়িষ্টাডের কাছাকাছি আরেকটা ফ্যুয়েরার বাংকারের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়। এখানে বলা হয়তো বা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে ফ্যুয়েরারের দুটো ট্রেন ছিল। একটার কোড নাম ছিল ব্রানডেনবুর্গ; আর অপরটি আমেরিকা। তবে এইসব বাংকারে হিটলার বড়জোর কয়েক সপ্তাহ করে থেকেছে। কয়েকটা তো মাত্র পরিদর্শন করেছে। সবচেয়ে বেশীদিন কাটিয়েছে ইষ্ট প্রুশিয়ার রাসটেনবুর্গ বাংকারে। প্রায় তিন বছর। এই বাংকারটার কোড নাম ছিল ওলফ্ সাঙে্। বা নেকড়ের কামড়।

নুরেমবার্গ ট্রায়ালে জেনারেল অ্যালফ্রেড জোডল রাসটেনবুর্গের বাংকারটাকে ক্লসটার আর কনসেনট্রেসন ক্যাম্পের মাঝামাঝি এক জায়গায় অবস্থিত বলে বর্ণনা করেছে।

রাসটেনবুর্গের ফ্যুয়েরারের এই হেড কোয়ার্টারটা কিন্তু মাটির নীচে ছিল না। দেওয়াল দিয়ে ঘেরা বিরাট কংক্রিটের ব্লক। বাইশ ফুট চওড়া দেওয়াল আর সাড়ে ষোল ফুট পুরু মাথার ছাদ। সূর্যের আলোরও প্রবেশাধিকার এখানে ছিল না। ভেন্টিলেসানের ব্যবস্থাও ঘোরালো। জানালা বলতে কিছু নেই। লোহার দরজা বন্ধ করার বা খোলার ব্যবস্থা ছিল। দেওয়াল আর ছাদের এই চওড়া মাপ, যে কোন আর্কিটেকচারকে বিমূঢ় করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। বিভীষিকাই

বলা উচিত। ১৯৪১ সালে প্রথম তৈরী হলেও ১৯৪৪ সালে এটার প্রচুর পরিমাণে সম্প্রসারণ ঘটেছিল।

রাসটেনবুর্গ বনের মধ্যে চারদিকে মাসুরিয়ান লেকে ঘেরা। জেনারেল জোডল যে কনসেনট্রেসন ক্যাম্পের কথা বলেছে, তা' হলো ফ্যুয়েরার হেড কোয়ার্টারকে ঘেরা ছিল কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে। চারদিকের লেকগুলোতে প্রচুর মাছ। রাইথ্‌ চ্যান্সেলারীর অনেকেই সেইসব লেকে যেতো মাছ ধরতে। শীতের সময় চারদিকে বরফ; গরমের সময় মশার ঠেলায় অস্থির। আর বর্ষার রাতে এক নাগাড়ে বিরাট বিরাট ব্যাঙ্‌ ডাকতো লেকগুলোয়। বাংকারের লোকেরা মশার কামড়ে অস্থির হয়ে একবার লেকগুলোয় কেরাসিন ঢেলে দিলে ব্যাঙগুলো মরে যায়। হিটলার আবার শুয়ে শুয়ে ব্যাঙের ডাক উপভোগ করতে ভালোবাসতো। তাই পরের বারে শহর দূরের লেক থেকে ব্যাঙ ধরে এনে সেই লেকে ছাড়া হয়।

কয়েক মাস রাসটেনবুর্গে কাটানোর সময় জার্মান পানজ্‌সার বা ট্যাংক বাহিনী রাশিয়ার এতো ভেতরে ঢুকে পড়ে যে ফ্যুয়েরার হেড কোয়ার্টার থেকে ওদের দূরত্ব হয়ে পড়ে প্রায় নশো মাইল। ১৯৪১ সালে সংকটময় হেমন্তে। ইষ্ট প্রুশিয়া হলো রাইখ্‌র সবচেয়ে পূর্ব প্রান্তিক অঞ্চল। ফ্যুয়েরারও জার্মানী ছেড়ে উক্রাইনের ভিনিস্তাতে যায়। ভিনিস্তা বার্লিনের চেয়ে মস্কোর অনেক কাছে। ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মের একটা অংশ হিটলারের ভিনিস্তাতে সুখেই কাটে। এই হেড কোয়ার্টারটাও বনের মধ্যে তবে মাটির নীচে নয়। কাঠের ব্লক হাউস। অবশ্য লেলিনগ্রাদ বিধ্বংসের সময় ১৯৪২ সালে হিটলার আবার রাসটেনবুর্গে ফিরে এসেছিল। ১৯৪৪ সালের নবেম্বর পর্যন্ত হিটলার এই রাসটেনবুর্গের হেডকোয়ার্টারেই থেকেছে।

রাসটেনবুর্গে থাকলে প্রায়ই হিটলার আসতো বার্লিন, ব্রাখ্‌টেস গাডেন এবং মিবুনিকে। বিশেষ করে ৯ই নবেম্বর যতো কাজই থাকুক না কেন হিটলার মিউনিকে উপস্থিত থাকতোই। ১৯২৩ সালে মিউনিকের বীয়ার হলেই পুট্‌থ বা তৃতীয় রাইখের যাত্রা শুরু হয়েছিল।

১৯৪৩ সালে মর্কিন বোরম্যান মিউনিক শহরের শহরতলী পুলখে ফ্যুয়েরারের জন্য আরেকটা ফ্যুয়েরার হেড কোয়ার্টার তৈরীর নির্দেশ দেয়। কারণ বোমা বর্ষণের মধ্যে যদি হিটলারকে মিউনিকে আসতে হয়, আর ব্রাখটেস্‌গাডেনে ফিরে যেতে না পারে। এইসব কারণে সব সময়েই বেশ কিছু লোক নিযুক্ত থাকতো। বাওয়ারের তত্ত্বাবধানে। বাওয়ারের ভাষায়, মিউনিকে দু'জন পাইলট এবং ছ'টা মালবাহী প্লেন আর রাসটেনবুর্গে বারো জন পাইলট এবং চল্লিশটার ওপর এরোপ্লেন এই ব্যাপারে চব্বিশ ঘণ্টা প্রস্তুত রাখা হতো।

সবার ধারণায় সবশুদ্ধ ফ্যুয়েরারের হেড কোয়ার্টারের সংখ্যা ছিল বারোটা। যুদ্ধের পরে লিষ্টটা স্পীয়ারকে দেখালে, স্পীয়ার বলে একটা হেড কোয়ার্টার বাদ পড়ে গেছে। শুধু মাটির নীচের নির্মাণের ব্যাপার নয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে সেটাই ছিল সবচেয়ে বৃহদাকার। ১৯৪৪ সালে সিলিসিয়ায় এই নির্মাণ কাজ শুরু হয়। স্পা নদীর তীরের ছোট্ট শহর সারলোটনবর্নে। তখন পর্যন্ত ক্ষীণ একটা আশা ছিল যে, রেড আর্মি রাইখের শিল্পাঞ্চলে পা রাখার আগে তাদের বাধা দেওয়া সম্ভব হবে। এই বাংকারটার কোড নাম ছিল রাইজে বা জায়েন্ট। সন্দেহ নেই সঠিক নামকরনই করা হয়েছিল বাংকারটার, তবে হিটলার বা অন্য কেউ-ই এটার ব্যবহার করে নি। এই বাংকার-টার নির্মাণ কাজে প্রায় ষাটলক্ষ ডলার খরচ করা হয়েছিল। রাসটেনবুর্গ বাংকারের থেকে প্রায় চারগুণ বড় আর পুলখের থেকে দশগুণ বেশী খরচ পড়েছিল এটা তৈরী করতে।

ফ্যুয়েরার প্রটোকলের আঠারো নম্বরের নির্দেশ মতো হিটলারের দিনলিপির রেকর্ডে দেখা যায়, ১৯৪৪ সালের ২০শে জুন প্রায় আঠাশ হাজার শ্রমিক বিভিন্ন নির্মাণের কাজে ব্যস্ত ছিল।

১৯৪৪ সালের ২২শে সেপ্টেম্বরের মেমোতে দেখা যায় যে তখনকার নির্মাণ কাজগুলোতে আঠাশ হাজার কিউবিক ইয়ার্ড রেইনফোসর্ড কংক্রিট, দু'শো সাতাত্তর হাজার কিউবিক ইয়ার্ড মাটির নীচে পথ, ছত্রিশ মাইল রাস্তা, ছ'টা ব্রীজ এবং বাবট্টি মাইল

প্লাম্বিং পাইপ ব্যবহার করা হয়েছে।

বাড সারলোটনবনের জায়েণ্ট ফ্যুয়েরার হেড কোয়ার্টার একাই সমস্ত জার্মান নাগরিক অর্থাৎ সাত কোটি জার্মানের চেয়ে বেশী কংক্রিট ব্যবহার করেছিল। হ্যাঁ, ১৯৪৪ সালে যখন প্রত্যেকটি জার্মান পরিবারই এয়ার রেডের হাত থেকে বাঁচার তাগিদে ছোটখাট হলেও আশ্রয় নির্মাণে ব্যস্ত। সমস্ত জার্মানী যত্তো সিমেণ্ট ব্যবহার করেছিল, তার দশ ভাগ এখানেই খরচা করা হয়।

বাওয়ার সব বাংকারেরই খোঁজ জানতো। কারণ ধারে পাশে কোথায় এয়ার স্ট্রিপ পাওয়া যাবে, যাতে প্লেন ল্যাণ্ড করানো যায় তার খোঁজ খবর ওকেই রাখতে হ'তো। এমন কি সেই বাওয়ার পর্যন্ত জানতো না যে এই অব্যবহৃত বাংকারটার ব্যবহার কখনো করা হয় নি। ১৯৪৪ সালের শেষের দিকে জার্মান ইন্‌জীনিয়াররা এটাকে উড়িয়ে দেয়। আগুয়ান রাশিয়ানরা এই বাংকারটার অস্তিত্ব খুঁজে পায় নি। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার বেশ কয়েক বছর পরে পোলরা এই পরিত্যক্ত বাংকারটাকে খুঁজে বার করে। ১৯৪৫ সালে সিলিসিয়া নতুন পোল্যাণ্ডের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। জায়েণ্ট নির্মাণের এবং ইভাকুয়েসানের সময় সমস্ত জার্মান শ্রমিকদের শপথ করিয়ে নেওয়া হয় যে এই বাংকারটার খবর ওরা কোন ক্রমেই বাইরে প্রকাশ করবে না। সেইসব অঞ্চলের চাষীদের, যারা অনেকে এর নির্মাণ কাজে অংশ নিয়েছিল, ১৯৪৫ সালের প্রথম দিকেই তাদের সেই অঞ্চল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

বিশাল সরীসৃপের মতো আঁকা বাঁকা সিমেণ্টের স্তুপটাই বোধ হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সবচেয়ে বড় প্রজেক্ট। কিন্তু বার্লিন বাংকারের অবস্থাটা কী? ভাগ্যের পরিহাস, সবচেয়ে উপেক্ষিত এই বাংকারেই হিটলারের জীবনের যবনিকাপাত ঘটে। এয়োদশতম বাংকারটা ছাড়া আরো বারোটা বাংকার তখন জার্মানী তথা ইউরোপের এদিকে ওদিকে ছড়ানো ছিটানো। ফ্রান্সের সোসেনিয়া থেকে সুরু করে ব্লাক ফরেষ্টের-সিলিসিয়াতে, উক্রাইনের ভিনিস্তাতে। বার্লিনের

বাংকারগুলোর মধ্যে হিটলারের বাংকারটাই সবচেয়ে উপেক্ষিত ছিল। নীচের তলাটা ছোট। হঠাৎ এয়ার রেডের সময় বড়জোর দশ বারো জন আশ্রয় নিতে পারে। তাও সাময়িকভাবে। পাকাপাকি-ভাবে থাকার কোন ব্যবস্থাই নেই। অবিরত বোমাবর্ষণরত একটা শহরের মধ্যে দিনে রাতে কখনই শান্তিতে থাকার উপায় নেই।

রাইখ্ চ্যান্সেলারীতে চীফ্ ইলেকট্রিসিয়ান ছিল জোহানেস্ হানস্ হান্স্শেকেল। বাংকারের ইঞ্জিনরুমের ডিজেল মোটরও ছিল ওর-ই তত্ত্বাবধানে। এই ডিজেল মোটরের সাহায্যেই শেষের দিকে বাংকারের জল সরবরাহ বিদ্যুৎ এবং আলো বাতাসের ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছিল।

হান্সশেকেলের ভাষায়, শেষের পনরো দিন অবস্থাটা চরমে গিয়ে দাঁড়ায়। করিডরে ছড়ানো বিদ্যুতের তার। আগুন নেভাবার হোস্ পাইপ ব্যবহার করা হয়েছে জল সরবরাহ ব্যবস্থা বজায় রাখতে। কারণ বেশীর ভাগ জলের পাইপই তখন ফুটো হয়ে গেছে। বিদ্যুতের তার, জলের হোস্ পাইপ এমন জড়াজড়ি করে করিডরে পড়া যে স্পগেটির মতো অবস্থা আর কি। আর এক তলার বাংকারের যোগাযোগের অবস্থাও ছিল শোচনীয়। সরু একটা প্যাসেজ ছিল নতুন রাইখ্ চ্যান্সেলারী থেকে ওপরের বাংকারে যাওয়ার। এক মিটারের একটু বেশী গভীর। নড়বড়ে স্ট্রাক্চার। ১৯৪৫ সালের এপ্রিলের শেষে রাশিয়ান গোলন্দাজ বাহিনীর গোলার আঘাতে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। সেই সংকীর্ণ টানেলের ছাদে আবার কয়েকটা জায়গায় ভাঙা। দিনের আলো যেমন অবাধে প্রবেশ করে, তেমনি রাতের আকাশও স্পষ্ট নজরে আসে। ব্যাপারটা সম্ভবত হিটলারের জানা ছিল না। কারণ শেষের দিকে এই রাস্তাটা ব্যবহার করে নি হিটলার। নিউ রাইখ্ চ্যান্সেলারীর সেলারে আহত সৈনিকদের রাখার ব্যবস্থা আরো দুঃসহনীয়। ভেন্টিলেসানের ব্যবস্থা বলতে কিছু ছিল না। পাঁচশো থেকে সাড়ে সাতশো আহত সৈনিকদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। আঘাতের

চেয়েও দমবন্ধ হয়ে মরার সম্ভাবনা বেশী। হান্‌স্‌শেকেলে সেই একটা ডিজেল ইঞ্জিনের সাহায্যে হিটলার বাংকার থেকে রুবে গোল্ড-বার্গ পদ্ধতিতে সেই আহতদের সেলারে বাতাসের বন্দোবস্ত করে। এইজন্য ডিজেল ইঞ্জিনটার ওপরেও চাপ কম পড়ে না।

গুজব প্রচলিত যে শেষের দিকে হিটলারের বাংকারের ভেন্টি-লেসানের ব্যবস্থা নাকি ভেঙ্গে পড়েছিল। যার জন্য অনেকেরই দম বন্ধ হয়ে আসতো বা মাথা ধরতো। আসলে কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। হানস্‌শেকেলের ওপর হিটলারের আদেশ ছিল মিলিটারী কনফারেন্স চলার সময়ে ভেন্টিলেসান ব্যবস্থা বন্ধ রাখার। যাতে বাতাসে কেউ বিষ ছড়াতে না পারে। এর ধাক্কা হিটলারকেও সামলাতে হ'তো। তবু এই ব্যাপারে হিটলার ছিল জেদী এবং একগুঁয়ে। হানস্‌-শেকেলের কথায়, যখন বাংকারের উঁচু পদের অফিসাররা জেনারেটার প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়া সম্পর্কে অভিযোগ করতো, আসলে পেছনের ব্যাপারটা তারা জানতো না। কারণ প্রায় প্রত্যেক সময়েই জেনারেটারকে দুটো দিক সামলাতে হতো। বলতে আপত্তি নেই, আহত মুমূর্ষু যুবক সৈন্যদের প্রতি-ই ওর সহানুভূতিটা বেশী ছিল। যে কারণে প্রায়ই জেনারেটারকে ওদের জলের পাম্প চালু রাখার ব্যাপারে ব্যবহার করতো। বার্লিনের বাংকার সম্পর্কে হানস্‌শেকেলের মতামতকে যথেষ্ট মূল্য দেওয়া যেতে পারে। কারণ পুরো বাংকারের বৈদ্যুতিক তার টানা থেকে সমস্ত ব্যবস্থা ওর তত্ত্বাবধানে করা হয়েছে। উপরন্তু, ওর ঘরের ফ্ল্যাটের জানালা দিয়ে বাংকারে কী হচ্ছে না হচ্ছে দেখা যেতো ; কারণ শেষের পনেরো দিনের আগে চ্যান্সেলারীর এবং বাংকারের বেশীর ভাগ কর্মচারীই বার্লিন শহরের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতো। কিন্তু হানস্‌শেকলে থাকতো প্যাভিলিয়ান টাইপের তিনটে বাড়ীর মধ্যে একটাতে। চ্যান্সেলারীর বাগানে ছিল বাড়ী তিনটে। বাংকারের ইমারজেন্সী গেটের কাছ থেকে আধ মিনিটের দূরত্বে। দ্বিতীয় বাড়ীটার নাম ছিল 'খেমখা হাউস। বাসিন্দা এরিখ খেমখার নাম অনুসারে। হাইনজ্‌ লিঙে তৃতীয়

বাড়ীটায় থাকতো। ১৯৩৮ পুরো অঞ্চলটাকে ঢেলে সাজালেও কি যেন হিটলারের মাথায় ঢোকে, যার জন্য এই তিনটে বাড়ী অক্ষত অবস্থায় থেকে যায়।

১৯৩৩ সালের গ্রীষ্মকালে ছাব্বিশ বছর বয়স্ক হান্‌সশেকেলে পুরনো রাইখ্‌ চ্যান্সেলারীর চাকরীতে এসেছিল। বিসমার্ক থেকে সুরু করে ব্রুয়েনিং এবং হিটলার পর্যন্ত এই বাড়ীটাতেই কাটিয়েছে। হানস্‌শেকেলে হঠাৎই চাকরীটা পেয়ে গিয়েছিল। পুরনো চ্যান্সে-লারীতে বিদ্যুতের তারে গণ্ডগোল হলে হিটলার উইলিয়াম ফুকনারকে পাঠিয়েছিল ধারপাশ থেকে একজন ইলেকট্রিসিয়ানকে ধরে নিয়ে আসতে। হানস্‌শেকেলে উইলহেলম্‌ ষ্ট্রাসেতে কাজ করছিল। ফুকনার ওকেই ধরে নিয়ে আসে পুরনো চ্যান্সেলারী বিল্ডিংয়ে। হিটলারের কাছে।

হানস্‌শেকেলের ভাষায়, আসলে ব্যাপারটা নিয়মমাফিক সর্ট সার্কিটের গণ্ডগোল। জায়গাটা থেকে কালো ধোঁয়া উদ্গীরণ হচ্ছিলো। কিছুক্ষণ আমি ধোঁয়াটাকে উঠতে দেই; তারপরে সারাই। হিটলারের আমার কাজটা পছন্দ হলে তৎক্ষণাৎ আমাকে পার্মানেন্ট চাকরী অফার করে। এমন কি জিজ্ঞাসাও করে না আমি নাৎসী পার্টির সদস্য কিনা। আমি কিন্তু সদস্য ছিলাম না। সবেমাত্র বিয়ে করেছি; সুতরাং মাথার ওপরে একটা ছাদের তখন বিশেষ প্রয়োজন। আমার স্ত্রী আর আমি থাকার জন্য কয়েকদিনের মধ্যে ফ্ল্যাটে যাই। পরে বাড়ীটার নাম মুখে মুখে 'হানস্‌ হাউস্‌' বলে চাউর হয়ে পড়ে। তখন সারা পৃথিবীতে অর্থনৈতিক হতাশা চলেছে। সেইদিনে যে লোকটা দেশ শাসন করেছে, সে নিজে থেকে এতো ভালো মাইনেতে একটা চাকরী দিয়েছে, সুতরাং আমার মানসিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

১৯৩৬ সালে এয়ার রেডের হাত থেকে বাঁচার জন্য মাটি থেকে তিরিশ ফুট নীচে আশ্রয়ের নিমিত্ত খোঁড়াখুড়ি সুরু হয়। সেই বছরেই সরকারীভাবে যুদ্ধের তোড়জোড়ও আরম্ভ করা হয়। এই

বাংকারটা অবশ্য পুরোন রাইখ্‌ চ্যান্সেলারীর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। কারণ তখনো নতুন রাইখ্‌ চ্যান্সেলারী গড়ে ওঠে নি। এর জন্যই বোধহয় হিটলার বাংকার মাটির এতো কাছাকাছি পুরনো চ্যান্সেলারীর বাগানে ছিল।

পুরনো আর নতুন রাইখ্‌ চ্যান্সেলারীর বাড়ী দুটো পরস্পর সমকোণ করে দাঁড়িয়েছিল। পুরনো বাড়ীটা যেটাকে একদা রাডজিভিল প্যালেস বলা হতো, সেটার মুখ ছিল উইল্‌হেলম্‌ ষ্ট্রাসে এবং উইল্‌হেলম্‌ প্লাটৎজের দিকে। নতুন বাড়ীটা দু'টো রাস্তার কোণে দাঁড়ানো। লম্বায় পুরো ভাস্‌ ষ্ট্রাসেটাকে অধিকার করে বসে রয়েছে। দু'টো বাড়ীর কোণ গিয়েই মিলিত হয়েছে উইল্‌হেলম্‌ প্লাট্‌ৎজে। হিটলারের ব্যক্তিগত ফ্ল্যাট্‌ ছিল পুরনো রাইখ্‌ চ্যান্সেলারীতে; কিন্তু একটা করিডর দিয়ে নতুন চ্যান্সেলারীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। ১৯০৬ সালে খোঁড়া আরম্ভ করলেও ১৯৩৮ সালে বাংকারটাকে বড় করা হয়। আর বড় কারণেই হিটলার বাংকার ঠিক কেন্দ্রে গড়ে ওঠে নি। বিরাট বড় কমপ্লেক্সের একটা কোণের দিকে পড়ে গেছে। দুটো বাড়ী বহু বছরের ব্যবধানে গড়ে উঠেছে। পুরনো রাইখ্‌ চ্যান্সেলারীটা ছিল ইংরেজী এইচ অক্ষরের মতো। চারটে উইং সহ মূল বাড়ীটা তৈরী হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। বাড়ীরই একটা উইং প্রায় আবার বাংকারের ওপরেই দাঁড়িয়েছিল। ১৯৪৩ সালে ভেঙ্গে পড়ে সেটা।

টানেলের মধ্যে দিয়ে বাংকারে যেতে হ'তো না। পুরনো রাইখ্‌ চ্যান্সেলারীর পশ্চিমদিকের সেলারের সিঁড়ি বেয়ে ফুট পনরো নামলেই বাংকারে পৌঁছনো যেতো।

নতুন রাইখ্‌ চ্যান্সেলারী তৈরী করা হয়েছিল ১৯৩৮ সালে। বাড়ীটায় বাংকার ছিল না। তবে অ্যালবার্ট স্পীয়ার সেলারটাকে এমনভাবে ডিজাইন করেছিল যাতে প্রয়োজনে এটাকে বাংকারে পরিবর্তন করা যায়। ১৯৪৩ সালে যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে তাই করা হয়েছিল। নব্বই ফুট লম্বা পাঁচ ফুট মাটির নীচে একটা টানেল খুঁড়ে

আপার বাংকার আর নতুন রাইখ্ চ্যান্সেলারীর সঙ্গে যোগাযোগ করে দিয়েছিল। হানস্‌শেকেলের ধারণায় ১৯৩৯ অথবা ১৯৪০ সালে এই টানেলটা খোঁড়া হয়েছিল। সত্যিকারের বিমান যুদ্ধ সুরু হওয়ার আগে ব্যাপারটা মোটামুটি এইরকম ছিল। তখন বৃটিশ সবচেয়ে বড় বোমার ওজন ছিল ছ'শো পাউণ্ড।

যুদ্ধ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে টানেলের সংখ্যাও বেড়ে চলে। রিবেনট্রপের বিদেশ মন্ত্রক এবং গোয়েবেলসের প্রপাগাণ্ডা মন্ত্রকের অফিস তো মাটির নীচেই নিয়ে যাওয়া হয়। পুরো সিটি ব্লকটাই মাটির নীচের পথ পেরিয়ে সোজা টানেল দিয়ে গিয়ে হাজির হয় ফ্যুয়েরারের বাংকারে। সমস্ত সরকারী অফিসই তখন মাটির তলায়। ডাউন টাউন গবমেণ্টাল লিবারেন্থ। বাংকার তৈরীর ইতিহাস হানস্‌শেকেলের বর্ণনায়, ১৯৪৩ সালে বার্লিন শহরের ওপরে বিরাট আকারের বোমা পড়তে শুরু করলে বেসরকারী একটা কনস্‌ট্রাক্‌সান কোমপানিকে আপার বাংক রেইনফোর্স করতে বলা হয়। বেসরকারী সেই সান কোমপানিটার নাম ছিল হোখ্‌টিপ্। অর্থাৎ উঁচু-নীচু। অবশ্য ১৯৪৪ সালের আগে কাজ সুরু করে নি। ওরা বাংকারটাকে আরো গভীর করে; ফ্যুয়েরার এবার নীচের বাংকারেই যায়। ছাদ ষোল ফুটের ওপরে চওড়া করা হয়। দেওয়াল ছ'ফুট। টন টন মাটি বাংকারটা গভীর করতে গিয়ে তুলে বাংকারের পাশেই জড়ো করে রাখা হয়। পাকাপাকিভাবে নীচের বাংকারটা কখনোই সম্পূর্ণ হয় নি। হিটলার কিন্তু আর নীচের বাংকার ছেড়ে ওপরের বাংকারে আসে নি। কারণ আপার বাংকারের করিডরে শেষ দিনগুলোয় মেস চালানো হ'তো। শেষের দিনগুলোর মাত্র একবার হিটলার এই আপার বাংকারে করিডরে এসেছিল। নার্সদের কাছ থেকে বিদায় নিতে। তবে আরেক অর্থে ষ্টাডি ছেড়ে হিটলার আপার বাংকারের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল মাত্র।

আপার এবং লোয়ার বাংকারের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করতো লোহার একটা সিঁড়ি। দশ থেকে বারোটা সেই সিঁড়ির ধাপ।

একটা ইস্‌পাতের দরজা লোয়ার বাংকারের মুখে বসানো ছিল। সামনে দু'জন মেসিনগান হাতে সেনট্রি। হিটলার লোয়ার বাংকারে থাকায় আপার বাংকার একরকম সার্ভেন্ট কোয়ার্টার হয়ে দাঁড়ায়। খাদ্যদ্রব্য প্যান-ট্রি, বিরাট বড় ওক টেবিল, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদিতে ঠাসা।

॥ তিন ॥

শীত দেরী করে আসায় তার রেশ টেনে চলে সেই বছরের পুরো ফেব্রুয়ারী মাস। ওডার নদীর তীরের রেড আর্মির অগ্রগতি হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে পড়ে। ইয়েলটাতে মিত্রশক্তি তখন কনফারেন্সে বসে গেছে। প্রতি সন্ধ্যায় সাতটা থেকে ন'টা পর্যন্ত হিটলারের তিনসঙ্গী মার্টিন বোরম্যান, ডক্টর জোসেপ গোয়েবেলস্‌ এবং রবার্ট লে সান্ধ্য মজলিস জমায়। হ্যাঁ, বাংকারের মধ্যেই। মাঝ-রাত্তিরে হিটলার চুপচাপ শোনে মিলিত আমেরিকা ও বৃটিশ সৈন্যের অগ্রগতি খবর। রাইনের পশ্চিম পাড়ে ওদের ফ্রন্ট চওড়া হচ্ছে ; তবে এখনো কোলনে পৌঁছতে পারে নি। কোলনই হলো রাইনল্যাণ্ডের বৃহত্তম শহর ও যোগাযোগ কেন্দ্র। তবে ইতিমধ্যে এটা সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে ওদের কিছুতেই ঠেকানো যাবে না।

হিটলারের তখনো আশা যে হয়তো বা ওদের প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। বিশেষ করে মধ্য ইউরোপের দানিয়ুব নদীর অববাহিকা অঞ্চল থেকে যে ছুটো ট্যাংক বাহিনী আরডেনিসে বিপর্যস্ত হয়েছিল, কোনরকমে তাদের জড়ো করে নতুন টাইগার ট্যাংক সরবরাহ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। টাইগার ট্যাংক তখন রুড় অঞ্চলের কারখানায়

থেকে তৈরী হয়ে বুদাপেস্তের দিকে যাত্রা করেছে; এস এস জেনারেল ডিট্রিচ্ এই ট্যাংক বাহিনী নেতৃত্ব দেয়। বারোই ফেব্রুয়ারী বুদাপেস্তের পতন হয়।

১৯৪৫ সালে ফেব্রুয়ারীতে সবচেয়ে কার্যক্ষম ছিল তৃতীয় ফ্রন্ট। কারণ আকাশ যুদ্ধ রাইখের তরফ থেকে একরকম শেষ হয়ে গেছে বলা চলে। হিটলার এবং রাইখের যারা বাংকারে, তাদের এ'কথাটা বেশ ভালোভাবেই জানা। ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি থেকেই বসন্ত রীতিমতো হাতছানি দিতে সুরু করেছে। ঝকঝকে নীল আকাশের অর্থই হলো পরবর্তী একুশ দিন ধরে দিনে রাত্রে এক নাগাড়ে বোমাবর্ষণ চলবে। সেই কারণেই ইউ এস এয়ার ফোর্স, বোমাবৃষ্টি করে চলে গেলে আর রয়াল এয়ার ফোর্স এসে পৌঁছনোর আগে বাংকারের মধ্যের নাজীরা মিটিংয়ে বসে যায়।

শহর বার্লিন একক না হলেও অন্যতম লক্ষ্যবিন্দু ইউ এস এয়ার ফোর্স আর রয়াল এয়ার ফোর্সের। বারো থেকে চৌদ্দই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত একটানা অ্যাংলো আমেরিকান মিলিত শক্তি শহর ড্রেসডেনের ওপরে যে বোমাবর্ষণ করেছিল তার বোধহয় তুলনা নাই। এর কারণ অবশ্য হিটলারের ট্যাংক বাহিনী দুটোকে নিশ্চিহ্ন করা। সেই সময় রেলে করে পশ্চিম সীমান্ত থেকে দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো ট্যাংকগুলোকে। পুরো শহরটাকে মিত্রশক্তির বোমা মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। একটা শহরে বোমায় আগে কখনো এতো মানুষ হতাহত হয়নি। তবে জার্মান ট্যাংক কিন্তু ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকেই শহর পেরিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়েছিল। পঞ্চম বাহিনীর কাছ থেকে ইংল্যাণ্ড দেরীতে খবর পায়। এই বোমাবর্ষণে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার নাগরিক, যার মধ্যে অধিকাংশ উদ্বাস্তু, মারা যায়। অতো সুন্দর শহর ড্রেসডেনের অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে পড়ে।

এরপর আসে মার্চ মাস। রাশিয়ানরা ওডার নদী ঘিরে নিজেদের সুসজ্জিত করে তোলে। তিনটে ফ্রন্টে। উত্তরে পোর্ট অফ ষ্টেটিনকে

ঘিরে মার্শাল কে কে রেকোসোভস্কি তার সেকেণ্ড, হোয়াইট রাশিয়ান ফ্রন্ট নিয়ে তৈরী। কেন্দ্রস্থলে ফ্রাংকফুটের কাছে 'ওডার' নদীর ধারে মার্শাল গ্রেগরী জুকভ কমাণ্ড করছে ফার্ষ্ট হোয়াইট রাশিয়ান ফ্রন্ট। দক্ষিণে ওডার আর নিস্ নদীর সংগমস্থলে মার্শাল ইভান কনিভ্ তার ফার্ষ্ট উক্রানিয়ান ফ্রন্ট নিয়ে তৃতীয় রাইখ্কে আক্রমণের জন্য পা ঠুকছে।

কেমদে হের ওষ্ট, জার্মান সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের কর্তা, হিটলারকে সঠিক রাশিয়ার সামরিক শক্তি জানিয়ে দিয়েছিল। রেড আর্মিতে ছিল পঁচিশ লক্ষ পদাতিক সৈন্য, ছ'হাজার ছুশো পঞ্চাশটা ট্যাংক। সাত হাজার পাঁচশো এয়ার ক্র্যাফ্ট। অর্থাৎ জার্মান সৈন্য বাহিনীর তুলনায় অনেক বেশী সুসজ্জিত। সৈন্য সংখ্যার তুলনায় তিনগুণ, আকাশ শক্তিতে চারগুণ, ট্যাংকে পাঁচগুণ আর পদাতিক বাহিনীতে কমপক্ষে দশগুণ বেশী।

পূর্ব রণাঙ্গনে হিটলার রেড আর্মিকে রুখতে নিয়োজিত করেছিল আর্মি গ্রুপ ভিশ্চুলা। ভিশ্চুলা বাহিনী ছিল ছুটো ইনফেনট্রি, এবং টুয়েভয়। তবে ছুটোতেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক সৈন্যের খামতি ছিল। রেড আর্মির মোকাবিলা করার মতো একমাত্র ছিল জার্মান থার্ড এবং ফোর্থ ট্যাংক বাহিনী। অবশ্য দ্বিতীয় লাইনও হিটলার রেখেছিল। পূর্ব সীমান্তে। যদি প্রথম সারি ঠিক রেড আর্মির সঙ্গে এঁটে উঠতে না পারে। সেই কারণে। সেই বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল কিন্তু মার্শাল শ্রয়েনার। তবে শ্রয়েনারকে চেকোশ্লাভিকিয়ার সীমান্তে ব্যস্ত থাকতে হয়। সুতরাং বার্লিন রক্ষার ব্যাপারে শ্রয়েনার কোন কাজেই আসে নি।

পুরো মার্চ মাস ধরে হিটলারের মনোযোগ পশ্চিম রণাঙ্গনের দিকেই রাখতে হয়। জেনারেল আইসেনহাওয়ারের সম্মিলিত বাহিনী ভেতরে ঢুকে পড়ার তোড়জোড় করছে। একদল হল্যাণ্ড থেকে আলসাসের দিকে আর অপরদল সুইজারল্যাণ্ড সীমান্তে এসে হাজির। এই মার্চ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর শহর কোলনের পতন হয়েছে। প্রথম আমেরিকান

সৈন্য বাহিনী রাইখ্ নদী পার হয় ৭ই মার্চ। রেমাগেন দিয়ে। এতো তাড়াতাড়ি এসে ওরা রেমাগেনে এসে হাজির হয়েছিল যে জার্মানরা রেলব্রীজ উড়িয়ে দেওয়ার সময়টুকু পর্যন্ত পায় নি।

এক সপ্তাহ বাদে জেনারেল প্যাটন রাত্রিরবেলা মাইনজ্ এর কাছে ওপনহাইমে রাইখ্ পার হয়। মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ফিল্ড মার্শাল মণ্টগোমারীর নেতৃত্বে টুয়েন্টি ফার্স্ট আর্মি গ্রুপ বাসেলের কাছে বিমান বাহিনীর ছত্রছায়ায় লোয়ার রাইখ্ পার হয়ে জার্মান সীমান্তে ঢুকে পড়ে। সেই অঞ্চলে তখনো পুরো একটা জার্মান বাহিনী অক্ষত রয়েছে। হিটলারের কড়া আদেশ হয় সেই বাহিনীর ওপরে। যেমন-ভাবে হোক রুঢ় অঞ্চল ধরে রাখতে। তবে লোয়ার রাইখ্ পার হয়ে মণ্টগোমারীর বাহিনী ঢুকে পড়তে ব্রিটিশ সেকেণ্ড এবং আমে-রিকান নবম বাহিনীও যোগ দিয়ে বার্লিন যাত্রা করে। সোজা তিনশো মাইল রাস্তাটা চলে গেছে শহর বার্লিনে। পনরো দিনের মধ্যে বিমান এবং ট্যাংক বাহিনীর ছত্রছায়ায় বার্লিনে পৌঁছনো সম্ভব।

জেনারেল গুডিরিয়ান ছিল বাংকারে হিটলারের ব্রীফিং অফিসার। একদিন হিটলার তাকে জিজ্ঞাসা করে, ব্রিটিশ এবং আমেরিকান সম্মিলিত বাহিনী চওড়া কিন্তু এতো ধীরগতিতে এগোচ্ছে কেন? জেনারেল গুডিরিয়ান যথাযথ তার উত্তর দিতে পারে না। কারণ সব জেনারেলের পক্ষেই সব সময় জানা সম্ভব নয়। পাহাড়ের ওপাশে কি আছে। যদিও জেনারেল গুডিরিয়ানের ভালো মতোই জানা ছিল যে বাসেল আর বার্লিনের মধ্যে মিত্রশক্তিকে বাধা দেওয়ার মতো জার্মান সৈন্য নেই বললেই চলে। শেষমেষ হিটলারকে বলে যে সবকিছু নিয়ে এখন রাইনের পুর্বদিকে সরে যাওয়া উচিত। ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে বাংকারের অবস্থা গুডিরিয়ানের ভাষায়; হিটলার সারাটা জীবন ধরে ম্যাপের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ বোধ করতেন। ম্যাপ পড়ার ব্যাপারেও হিটলার বেশ দক্ষ ছিল। উপরন্তু, ওর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম থেকেই জার্মান বড় শহর-গুলোর প্রতি পছন্দ বা অপছন্দটা তীব্রভাবে গড়ে উঠেছিল।

বর্তমানে পাথরের স্তব্ধতায় হিটলার চুপচাপ বসে এয়ার ফোর্সের অফিসারদের পড়া খবর শুনতো। মিত্রশক্তির বোমাতে ন্যুরেমবার্গ, হামবুর্গ, হ্যানওভার, মিউনিখ প্রভৃতি শহরগুলো প্রায় মাটিতে মিশে গেছে।

তারপরের ঘটনা। নাইন্‌থ আর্মির জেনারেল বুফে তখন প্রাণপণে বার্লিন শহর রক্ষার চেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু মিলিত শক্তির সঙ্গে এঁটে ওঠা কি সম্ভব। মানসিক এবং দৈহিক উভয় দিক থেকেই বিপর্যস্ত ২৮শে মার্চ বাংকারে মিলিটারী কনফারেন্সের সময় হিটলার জেনারেলদের বিশেষ করে জেনারেল বুফের সমালোচনা করলে গুডিরিয়ান ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। ফ্যুয়েরারের সামনে রীতিমতো মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলতে হিটলার অবাক হয়ে যায়। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে ফ্যুয়েরার সেই দিনের কনফারেন্স বন্ধ করে দেয়। তারপর জেনারেল গুডিরিয়ানের দিকে ফিরে বলে—তুমি ছ'সপ্তাহের ছুটিতে যাও। পরে আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজে তোমার প্রয়োজন পড়বে।

ব্যাপারটা কিন্তু সেদিন হঠাৎ-ই ঘটে গিয়েছিল। ফ্যুয়েরার বাংকারে সেদিন দুপুর বেলার কনফারেন্স বাতিল করে দেওয়ায় গুডিরিয়ান এবং ওর এক বন্ধু টিয়ারগার্টেনের কাছে জাপানী দূতাবাসে রাজদূত হিরোসি ওসিমার কাছে গিয়েছিল ব্ল্যাক ফরেষ্টের চেরী ব্রাণ্ডি খেতে। ওসিমা পড়াশোনা করেছে ফ্রাইবুর্গে। তখন থেকেই ব্ল্যাক ফরেষ্টের চেরী ব্রাণ্ডি ওর প্রিয়। গুডিরিয়ানের তাই। কিন্তু ছুটোর সময় হিটলার যখন বাতিল করা কনফারেন্স ডেকে বসে তখন বেশ কিছুটা তরল চেরী ব্রাণ্ডি গুডিরিয়ানের পেটে। সেই মুডেই গুডিরিয়ান হিটলারের মুখের ওপর বলে বসে যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানীর হার একেবারে দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে।

শুধু গুডিরিয়ানই নয়, বাংকারের আরো একটা গলা চুপ করিয়ে দেয় হিটলার। সেটা হলো অ্যালবার্ট স্পীয়ার।, আর্কিটেক। একদা যে নাকি হিটলারের সবচেয়ে নিকটতম বিশ্বস্ত সঙ্গী ছিল। স্পীয়ার ইচ্ছে করেই বাংকারে না থেকে বাংকারের বাইরে গোটা

চারেক বাড়ী দূরে থাকতো। প্যারিজার প্লাট্ৎসের যে অংশটায় স্পীয়ার থাকতো, মিত্রশক্তির বোমায় তা প্রায় বিধ্বস্ত হলেও স্পীয়ার বা তার মন্ত্রক জায়গা বদল করেনি। ব্রানডেনবুর্গ গেটের কাছেই ছিল প্যারিজার প্ল্যাট্ৎস। বার্লিন শহরের শহরতলীতে মোটামুটি গোছের একটা বাড়ীও তৈরী করিয়েছিল স্পীয়ার। কিন্তু ইতিমধ্যে তা' বোমার আঘাতে মাটিতে মিশে গেছে। তাই শহরের কেন্দ্র বিন্দু এই প্যারিজার প্লাট্ৎসে থাকাটাই বেছে নিয়েছিল যাতে যতো ভয়জনক ব্যাপারই ঘটুক না কেন, নিজের চোখে তা' প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। মাঝে মাঝেই স্পীয়ার সামনের ফ্ল্যাক টাওয়ারের ওপরে উঠে দেখতো, চোখের সামনে তার পরিকল্পিত শহরটা কেমনভাবে বোমার আঘাতে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। স্পীয়ারের নিজস্ব জরুরী অফিসটার অবস্থাও হয়ে উঠেছিল শোচনীয়। জানালার সার্সি বলতে মাত্র দু'একখানাই ছিল অক্ষত। ঘর গরম করার ব্যবস্থা, আলো, কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। স্পীয়ারকে মোমবাতির আলোয় কাজ করতে হ'তো। সেই অফিসের একটা প্রান্তে স্পীয়ার বসবাস করতো। সংসারে তখন এর বলতে ছিল রাঁধুনী ক্লারা, আর প্রিয় কুকুর। কালো সাদায় মেশানো বিশাল শ্যাগি ল্যাণ্ডশীয়ার। অনেকটা সেন্ট বার্নাডের মতো দেখতে। নিজের বৌ মার্গারিটে এবং ছয় ছেলেমেয়েকে ইতিমধ্যে স্পীয়ার ব্রাখটেস গাডেনে পাঠিয়ে দিয়েছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে স্পীয়ার ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৪ সালের মধ্যে যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রায় দ্বিগুণ করে তুলেছিল। কোন কোন সরঞ্জামের উৎপাদন তো তিনগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিমাসে উৎপাদন হচ্ছে তিন হাজার বোম্বার প্লেন, নশো টাইগার আর প্যান্থার ট্যাংক। ন'মাসে দু'টো সাবমেরিন। সিন্থেটিক গ্যাসোলিনের উৎপাদন অবশ্য ইতিমধ্যে প্রায় সত্তর ভাগ কমে গেছে। কারণ হিসেবে বলা যায়, লুইনা এবং আই জি ফারবেনের হাইড্রোজেনারেল প্ল্যান্টে বোমাবর্ষণ।

স্পীয়ার নিজের পেশাটাকে রীতিমতো রক্তের মধ্যে মিশিয়ে

ফেলেছিল। জার্মানীর পাহাড়, উপত্যকা, নদী, ঝরণা, বন— সব কিছুকেই প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো। প্রথম যৌবনে ন্যাশনাল সোসিয়্যালিজিমকে ভালো লাগলেও ১৯৪৪ এবং ১৯৪৫ সালে আর সেই আবেগকে ধরে রাখতে পারে না। নিজে 'মাইন ক্যাম্প' না পড়লেও বাহাত্তর বছরের বৃদ্ধ সীমেন্সের ম্যানেজার ডক্টর ফ্রেডরিগ্ লুইসেনের মুখে মাইন ক্যাম্পের একটা অংশ বিশেষ ওর মনে গভীর দাগ কেটে যায়। 'কূটনীতির কাজ হলো কোন জাতিকে নায়কোচিত-ভাবে কবরে প্রস্থান করানো নয়, বরং তার অস্তিত্ব বজায় রাখা। যে সমস্ত পথে সেই সম্ভাবনা রয়েছে, তাকে এড়িয়ে চলা উচিত ; আর তা' না করতে পারলে সেটা হবে অপরাধমূলক কর্তব্যে অবহেলার সামিল।

বার্লিনের সুদীর্ঘ অপরাহ্ন এক সময় ছোট হয়ে আসে। দু' একটা জানালার সার্সি যা তখনো অবশিষ্ট রয়েছে, তা' দিয়ে নজরে পড়ে এক হাঁটু বরফ ভেঙ্গে বার্লিনের অধিবাসীরা বাড়ীর দিকে ফিরছে। ক্লান্ত পদক্ষেপে। ভাঙ্গা মনে। বরফ শীতল ঘরের কোণে বা সেলারে আশ্রয় নেওয়ার জন্য। কিছুটা দূরের ফ্ল্যাক টাওয়ারের ওপর আগামী বোমা বর্ষণের আশংকায় কয়েকটা কাক একনাগাড়ে ডেকে চলেছে। এক সময় সন্ধ্যা নামে। বরফের ওপর পড়ে ম্লান চাঁদের আলো। স্পীয়ার অনেক চিন্তাভাবনার পর সন্ধ্যে গোটা সাতেক নাগাদ মনস্থির করে ফেলে। কারণ জানে হিটলার এখন গোয়েবেলস্, বোরম্যান আর লে'র সঙ্গে বাংকারে মিলিটারী কনফারেন্স নামক বিলাস আলোচনায় মগ্ন।

গরম ওভার কোট পরনে, তার ওপর স্পীয়ার ভাইসরয় ক্যাপ্টা চড়িয়ে নেয়। মাটির তলায় গ্যারেজে আসে। মন্ত্রী হিসেবে ওর প্রাপ্য লিমুজেন গাড়ী। সোফিয়ার এবং বডিগার্ড। সেসব কিছু না নিয়ে নিজেই ষ্টিয়ারিংয়ে বসে স্পীয়ার।

ব্রানডেনবুর্গ গেটের কাছের মাটির তলার গ্যারেজ থেকে গাড়ীটা বার করে আনে উনটার ডেন লিনডেনে। উনটার ডেন লিনডেন

অঞ্চলটা প্রায় নির্জন। কয়েকটা দম্পতি শুধু আদ্‌লন হোটেলের দিকে চলেছে। বারে মদ খেতে। আদ্‌লন হোটেলটাকে ঘুরে উইলহেলম ষ্ট্রাসেতে এসে পড়ে স্পীয়ার। আগে এখানে ডিপ্লোম্যাটিক কোয়ার্টার ছিল। বর্তমানে মিত্রশক্তির বোমায় ধূলিসাৎ। ট্রাফিক বলতে উইলহেলম ষ্ট্রাসেতে কিছু নেই বললেই চলে। তবু ধীরে ধীরে গাড়ীটা চালায় স্পীয়ার। রাস্তা বোমার আঘাতে এবড়ো খেবড়ো। বরফ পড়ে আছে। কে সরাবে! তবু ককটার খোয়ে-বেনসের প্রপাগাণ্ডা মন্ত্রক ভন রিবেনট্রপের বিদেশী মন্ত্রণালয় দুটোই বলতে গেলে একরকম ধ্বংস হয়ে গেছে। বাড়ী দুটো বিগত শতাব্দীর। মনে মনে খুসীই হয় স্পীয়ার।

উইলহেলম প্লাট্‌ৎসে পেঁাছে স্পীয়ার ওপরের দিকে তাকায়। পুরনো রাইখ্‌ চ্যান্সেলারীর ব্যালকনিটা। ১৯৩৪ সালে হিটলার ওকে প্রথম এই কাজের দায়িত্ব দেয়। গাড়ীটা এনে দাঁড় করায় এরেনহোফে। গার্ডরা ওকে দেখে, গুডেন আবেন্দ বা গুড ইভিনিং বলে ওঠে। এই সম্মানটুকু হিটলারের দৌলতে পেয়েছে স্পীয়ার।

সাড়ে সাতটা বাজে; শীতের প্রায় অন্ধকার সন্ধ্যা। এখনো চাঁদ ওঠে নি। স্পীয়ার হিটলারের সঙ্গে দেখা করতে এলে টানেল বেয়ে নীচে যায় বাংকারে। কিন্তু এখন নামে না। পুরনো রাইখ্‌ চ্যান্সেলারীর বাগানে ঘুরে বেড়ায়। বাগান অবশ্য এটাকে আর বলা চলে না। ধ্বংস স্তূপ বলাই সঙ্গত। সোজা হেঁটে যায় ব্লক হাউসের কাছে। যেটা বাংকারের ইমারজেন্সী একস্‌জিষ্ট হিসেবে কাজ করে। জলের ট্যাংক, স্তূপাকার সিমেন্টের মিকস্‌চার পার হয়ে আসে পাথর ছড়ানো সরু রাস্তায়। কখনো সখনো বাংকার ছেড়ে বেরলে হিটলার রাস্তাটাতে কুকুর ব্লণ্ডিকে নিয়ে বেড়ায়। এই সন্ধ্যায় স্পীয়ার একটা বিশেষ কাজ নিয়ে এসেছে। তা হলো যে পথ দিয়ে ভেন্টিলেশানের জন্য বাতাস বাংকারের ভেতরে প্রবেশ করে, তা দেখতে। এদিকের সব বাড়ীগুলোর নক্‌সাই ওর করা। একমাত্র বাংকার ছাড়া। যদি কোন নিরাপত্তা বাহিনীর লোক ওকে আগে দেখে প্রশ্ন করে। কেন

ও এখানে? তারজন্য মনে মনে একটা তৈরী করে রেখেছিল স্পীয়ার। হিটলার ওকে ভেন্টিলেশানের এয়ার-ইন্‌টেকের ফিলটারটা দেখতে বলেছে। সত্যি বলতে কি, বার কয়েক হিটলার স্পীয়ারকে চীফ টেকনিকের জোহানেস্ হান্‌সশেকেলের সঙ্গে এই ফিলটারটার পরিবর্তিত বা পরিষ্কার করা নিয়ে কথাবার্তাও বলতে বলেছিল। কিন্তু স্পীয়ার ফিলটারটাকে পরিষ্কার বা পরিবর্তন করার চিন্তা নিয়ে এখানে আজ আসে নি। আজ বিকেলেই মনস্থির করে ফেলেছে। বিষাক্ত গ্যাস ফিলটার করে বাংকারের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে আডলভ্ হিটলারের সঙ্গে সঙ্গে বাকী তিন শয়তানকেও হত্যা করবে। এরা সমস্ত একটা জাতিকে কবরের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। নিশ্চুপে সেই অভিযানে আজ সন্ধ্যায় বেরিয়েছে স্পীয়ার।

মরীয়া কাজের জন্য মরীয়া ব্যবস্থার প্রয়োজন। বাংকারের ইনটেকের পথে বিষাক্ত গ্যাস ঢোকালে এই চারজনের সঙ্গে নিরাপত্তা রক্ষী, টেলিফোনিষ্ট এবং সম্ভবত পাচকও মারা পড়বে। ওরা নিরপরাধ। অবশ্য প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্তে দামাল হাজার হাজার যে নিরপরাধী লোক দেশের মাটির বুকে লুটিয়ে পড়ছে, তাদের চেয়ে নিশ্চয়ই নিরপরাধী নয়।

এয়ার-ইন্‌টেকটা যা আশা করেছিল, তারচেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি খুঁজে পায় স্পীয়ার। মাটির সমতলে। আংশিকভাবে ঝোপের আড়ালে ঢাকা। লোহার গ্রিল দিয়ে ঘেরা। ইচ্ছে করলেই গ্রিলটা খোলা যায়। ফ্ল্যাশ লাইটের সাহায্যে অতি সহজেই ফিলটারটাকে খুঁজে পায়। সমস্যা বলতে কিছু নেই। স্পীয়ার মনে মনে ঠিক করে এই ফিলটারটার মধ্যে দিয়ে মারাত্মক টাবুন গ্যাস ঢুকিয়ে দেবে। এই গ্যাসের একটা টুক্‌রো যে কোন ফিলটার বা গ্যাস মাসকের ভেতর দিয়ে অতি সহজেই ঢুকে যায়। বাংকার বন্ধ থাকায় কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত বাংকারটাই গ্যাস চেম্বার হয়ে দাঁড়াবে।

টাবুনের আবিষ্কার হয়েছিল চিরাচরিত গ্যাস মাস্‌ককে অকেজো

করার জন্য। বাষ্পের বদলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুর মতো বাতাসে ঠিক মতো ছড়িয়ে দিতে পারলে ফিলটার বা মাস্কের মধ্যে ঢুকে টাবুন পুরো একটা ইনফ্যানট্রি প্ল্যাণ্টকে কয়েক মিনিটের মধ্যে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। হিটলার এই আবিষ্কারে অত্যন্ত খুসী হয়েছিল।

বাংকারের আশেপাশে মিনিট দশেক ঘুরে বেড়ায় স্পীয়ার। কিন্তু ভেতরে ঢোকে না। এমন কি মাঝরাত্তিরের দ্বিতীয় দফার মিলিটারী কনফারেন্সেও যোগ না দিয়ে সোজা ফিরে আসে নিজের অফিসে। একা একাই হাল্‌কা খাবার খেয়ে ঘুমোতে যায়। এখন সামনে যে সমস্যাটা সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দেয়, তা' হলো কারোর সন্দেহ না জাগিয়ে কী করে টাবুন গ্যাস জোগাড় করা যায়। কারণ স্পীয়ার জানে ওর দপ্তরের বেশ উঁচু পদে দু'জন গুপ্তচর কাজ করছে। যারা সোজাসুজি রিপোর্ট করছে রাইখ্ সিখার আমটে। সংক্ষেপে আর এস এইচ্ এ; হিমলারের অধীনে এই সিক্রেট সার্ভিস। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো এরা ঠিক দু'জনে কে কে তা' জানে না স্পীয়ার।

ভাগ্যের পরিহাসই বলতে হবে, যুদ্ধ মন্ত্রী হিসেবে লেকচার, টাইগার ট্যাংক, এমন কি ভি-২ রকেট পর্যন্ত হাতের গোড়ায় চাইলেই স্পীয়ার পেতে পারে; এডমিরাল ডয়েনিভস্ পর্যন্ত জার্মানীর সুন্দর ক্যানাল দিয়ে ওকে একটা সাবমেরিন পাঠাতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করবে। কিন্তু রাসটেনবুর্গে কর্ণেল ষ্টাউফেনবুর্গের হিটলারকে হত্যার চেষ্টার পরে বোমা, গ্রেনেড আর গ্যাস—এই তিনটে চাইলেই সবার সন্দেহ জেগে ওঠে। হাজার হাজার ডিফেন্সের কর্মী নিত্য টাবুন নিয়ে নাড়াচাড়া করে। বিভিন্ন কাজে। কিন্তু রাইখের এতো শক্তিশালী যুদ্ধমন্ত্রীরও এই টাবুনের ধারে কাছে যাওয়ার উপায় নেই।

কাকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া যায়? হ্যাঁ, টাবুন সংগ্রহের ব্যাপারে। দু'তিনদিন পরে সমস্যাটার সমাধান যেন আপনা থেকেই হয়ে যায়। মাঝরাতে এয়ার-রেডের সংকেত হিসেবে সাইরেন বেজে

উঠলে স্পীয়ার ওর মন্ত্রকের উঁচু অফিসারদের জন্য নির্দিষ্ট করা আশ্রয়ে এসে দেখে ডিয়েটার ষ্টালও সেখানে দাঁড়িয়ে। যুদ্ধ বাধার আগে ষ্টাল রসদ ডিপার্টমেণ্টের উঁচু পদে কাজ করতো। শহর বার্লিনের মাইল দশেক উত্তর-পশ্চিমের ছোট্ট শহর বারনাউতে ষ্টালের নিজের একটা ছোটখাটো মেসিন টুলসের কারখানায় কামানের গোলা তৈরী হয়। সুতরাং ষ্টালই হলো উপযুক্ত ব্যক্তি যে নাকি তার কারখানায় হয়তো বা গ্যাস শেল নিয়েও পরীক্ষা নিরিক্ষা চালাচ্ছে।

স্পীয়ারের সঙ্গে ষ্টালের পরিচয় বছর না গড়ালেও ওকে বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে। যুদ্ধে জার্মান হেরে যাচ্ছে—এই মন্তব্য করার জন্য বছর খানেক আগে গেষ্টোপারা ওকে গ্রেপ্তার করেছিল। আর সেই সময় ব্রানডেনবুর্গের গাওলাউটারের ওপরে স্পায়ার চাপ সৃষ্টি করে ওকে মুক্ত করেছিল। চাকরীও ছেড়ে যেতে দেয়নি। আসলে এই তরুণ শিল্পপতিকে ভালো লেগে গিয়েছিল স্পীয়ারের। এই ঘটনার পরেই হিমলারের কার্যকলাপ টের পায় স্পীয়ার। ষ্টালের সঙ্গে বন্ধুত্বও গড়ে ওঠে। এলবের কাছে, বার্ড ভিলস্নাকে ষ্টালের লেক-সাইড কটেজে বেশ কয়েকটা উইক-এণ্ড কাটিয়েছে স্পীয়ার। তবু যতোখানি সম্ভব সতর্ক হয় স্পীয়ার। বৃষ্টির ধারার মতো একনাগাড়ে বোমা পড়ে চলেছে। ছোট্ট ঘরটা থর থর করে কাঁপছে। ষ্টাল স্পীয়ারের হাতটা সজোরে আঁকড়ে ধরে বলে,—পাগলের কারবার সব। শেষটা যে কি ভীষণ মারাত্মক হবে, এর থেকেই বোঝা যায়।

সুযোগ পেয়ে স্পায়ার কয়েকটা প্রশ্ন করে ষ্টালকে। টাবুন গ্যাস সম্পর্কে। বিশেষ করে কিভাবে তা জোগাড় করা সম্ভব। অসংগত প্রশ্ন যে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ষ্টাল ব্যাপারটাকে সহজ-ভাবেই নেয়। যেন স্পায়ার ওর কাছে একটা সিগারেট বা লাইটার চেয়েছে। হয়তো বা এইভাবে স্পীয়ারের মনটাকেও বুঝতে চাইছিল ষ্টাল। শেষমেষ স্পায়ার খোলাখুলিই ষ্টালকে বলে,—জানো, একমাত্র

এই পথেই এই ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ইতি টানা সম্ভব। আমি ফ্যুয়েরারের বাংকারের মধ্যে টাবুন গ্যাস ঢুকিয়ে দিতে চাই।

ষ্টাল কিন্তু কথাগুলো শুনে আশ্চর্য হয় না। তবে জানায় আপ্রাণ চেষ্টা করবে টাবুন জোগাড় করতে। সেইদিনটা ছিল ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫ সাল।

দিয়েটার ষ্টালকেও স্পীয়ারের মতো সতর্কতার সঙ্গে এগোতে হয়। একদিন আর্মি অরডিনেন্স অফিসে যায় বন্ধু মেজর সোয়েকার সঙ্গে দেখা করতে। কথা বলতে বলতে বন্ধু সোয়েকারকে জানায় যে টাবুন গ্যাস নিয়ে পরীক্ষার জন্যও ওর বারনাউ প্ল্যান্টে আর্টিলারী শেলকে রি-মডেলিং করতে ইচ্ছুক। আলোচনার সময়েই বুঝতে পারে ষ্টাল যে ওর পরিকল্পনার কথাটা বানানো হলেও খুব চমৎকারভাবে পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খেয়ে গেছে। কারণ শেল বা গ্রেনেডের মধ্যে থাকা অবস্থায় ফাটলেই টাবুনকে একমাত্র কার্যকর করা সম্ভব। তবে বাংকারের মধ্যে টাবুন ভরা গ্রেনেড ছুঁড়লে পাতলা এয়ার কনডাকটার ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। ষ্টাল এই উল্লাসজনক খবরটা স্পীয়ারকে দিয়ে বলে যে ও আপ্রাণ কোন প্রচলিত গ্যাস খুঁজে বার করতে চেষ্টা করবে। যেমন মাস্‌টারড্‌ গ্যাস। এইভাবেই ফেব্রুয়ারী শেষ হয়ে যায়। মার্চ মুখ উঁকি দেয়।

টাবুনের জন্য অপেক্ষা করাকালীন বার তিনেক স্পীয়ার বাংকারে আসে আগের মতোই তিন শয়তান সেরম্যান, গোয়েবলস্‌ আর লে'র সঙ্গে হিটলার মিটিং করে চলেছে। একই সময়ে। একদিন একা ঘোরাফেরা করার সময়ে হানস্‌শেকেলের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় ওর। স্পীয়ার বোঝে মাস্‌টারড্‌ গ্যাস ব্যবহার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই; তাই কথা প্রসঙ্গে হানসের থেকে জানতে চায় ফিলটারটা কিভাবে ভেন্টিলেসান সিস্‌টেমের থেকে খুলতে হয়। হানস্‌শেকেলে যে কাজটা এতো তাড়াতাড়ি করে বসবে তা' ভাবতে পারে নি স্পীয়ার। দু'রাত্তির পরে স্পীয়ার দেখে ফিলটারটাকে ইতিমধ্যে বদল করা হয়েছে। বাঁধা হলেও অবশ্য তেমন বড় একটা কিছু নয়। মাস্‌টারড্‌

গ্যাস পৌঁছলে হান্‌সশেকেলেকে আবার ফিলটারটাকে খুলতে বলতে হবে।

ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটা দিন কেটে যায়। ৭ই মার্চ স্পীয়ারকে ষ্টাল খবর দেয় যে মাস্‌টারড্‌ গ্যাস জোগাড় হয়ে গেছে এবং আসছে। ৮ই মার্চই পেঁাছে যাবে। সুতরাং রাত গোটা সাতেক নাগাদ স্পীয়ার আবার ব্রানডেনবুর্গ গেটের থেকে রাইখ্‌ চ্যান্সেলারীতে আসে। আগের মতোই এরেনহোফে গাড়ীটা দাঁড় করিয়ে সংকীর্ণ পথটা ধরে সোজা বাংকারের দিকে হাঁটে।

চ্যান্সেলারী গার্ডেনের ভেতরে পা রাখতেই স্পীয়ারের ওপর উজ্জ্বল সার্চ লাইটের হঠাৎ আলো এসে পড়ে। বাংকারের ওপরে সার্চ লাইটটা লাগানো হয়েছে এবং চারজন অস্ত্রধারী এস এস গার্ড পাহারা দিচ্ছে। সেই আলোতেই স্পীয়ার দেখে ভেন্টিলেটারের এয়ার ইন্‌টেকের ওপরে প্রায় দশ ফুট একটা ধাতুর চিমনী; তার ওপরেই সার্চ লাইটটা ফিট করা। হঠাৎ ভয়ের একটা মৃত্যু শীতল স্রোত স্পীয়ারের শির দাঁড়ায় কেঁপে ওঠে। ঠিক ওই মুহূর্তে ওর মনে হয় ওর পরিকল্পনাটা নিশ্চয়ই কেউ ফাঁস করে দিয়েছে। স্পীয়ারের ভাষায়, অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীদের মতো নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়। নিশ্চয়ই কেউ আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। অথবা, আমার মন-ই হয়তো বা আমার সাথে তা' করে থাকবে। গত তিন সপ্তাহে আমার চোখ মুখের চেহারাই বদলে গেছে। দীর্ঘ একটা মুহূর্তের জন্য অনড় অচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি আমি। এমন কি মোড় ঘুরে সেই জায়গা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করার কথাটাও ভুলে যাই। সারা শরীরে নোন্‌তা স্রোতে ঘাম নামে। হঠাৎ ঘাড়ে মৃদু টোকা অনুভব করি। ঘুরে দেখি হাইন্‌রিখ হিমলার। আর্নেষ্ট কালটেন-ব্রুনার এবং গেষ্টাপো মুলার শান্তভাবে ছায়ায় দাঁড়িয়ে আমাকে গ্রেপ্তার করার জন্য অপেক্ষা করছে।

সবকিছুই চুপচাপ। নিস্তব্ধ। কিছুই ঘটে না। এমন কি প্রহরীরাও যেন ওই অনভিপ্রেত অতিথিকে নজরে আনে না

স্পীয়ারের থেকে ফুট চল্লিশেক দূরে দাঁড়ানো ; ওরা আলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলেও স্পীয়ার একটু পিছু হটে ছায়ায় এসে দাঁড়ায়। নিজেকে সামলে নিয়ে ও ওর এখানে আসার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে। জানুয়ারী মাস থেকেই হিটলার ভেন্টিলেটার সম্পর্কে অভিযোগ করে আসছে। হিটলার যখন বাংকারে এসে ঠাঁই নেয়, তখনো বাংকারটা সম্পূর্ণ হয় নি। হিটলার নিজেও মাস্টারড্ গ্যাসে প্রথম মহাযুদ্ধে আহত হয়েছিল। বাতাসের থেকে এই গ্যাস ভারী। তারজন্যই বোধহয় সতর্কতা হিসেবে চিমনি বসানো হয়েছে। হানস্শেকেলই দাঁড় করিয়েছে চিমনিটাকে।

সেই সন্ধ্যায় যখন স্পীয়ার রাইখ্ চ্যান্সেলারী ছাড়ে, নিজেকে মরীয়া জুয়াড়ীর মতো মনে হয়। এইমাত্র যেন রাশিয়ান রুলেট্ জুয়া খেলায় জিতেছে। বিষাক্ত গ্যাস সম্পর্কে তখন মনে বিরূপ ধারণা এসে গেছে। কারণ বর্তমান অবস্থায় বিষাক্ত গ্যাস বাংকারের মধ্যে প্রবেশ করানো একেবারেই অসম্ভব। চিন্তাটা যেন ওকে অনেকটা রেহাই দেয়। নিজেকে হাল্কা বলে মনে হয়। মনের থেকে হিটলারকে হত্যার পরিকল্পনাটা মুহূর্তে মুছে যায়। স্পীয়ারের মনে হয় তার চেয়ে হিটলারের পোড়া মাটি নীতিটা যাতে ব্যর্থ হয়, সেদিকে নজর দেওয়া উচিত।

হয়তো বা এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে হিটলারকে ন'বার হত্যার চেষ্টা করা হয়। ন'বারই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের দৌলতে হিটলার বেঁচে যায়।

এই বিশেষ অধ্যায়টার এখানেই শেষ হয় না। অ্যালবার্ট স্পীয়ার মনের থেকে হিটলার হত্যার ব্যাপারটা সরিয়ে দিয়ে মাসটারড্ গ্যাসের অর্ডারও বাতিল করে দেয়। ইতিমধ্যে মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ গড়িয়ে গেছে। ইউ এস নাইনথ্ আর্মড আর্মি রাইনের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। যে কোন মুহূর্তে রেড আর্মি ওডার নদী পেরোতে পারে। শহর বুদাপেস্তের পতন ঘটেছে। ভিয়েনা বে-দখল। হিটলারও পোড়ামাটির নীতি বাস্তবে রূপায়িত করার উদ্যোগ শুরু করেছে।

১৫ই মার্চ, ১৯৪৫ সাল। স্পীয়ার থার্ড রাইখের ইতিহাসে সবচেয়ে সাহসী মেমোরেণ্ডাম লিখতে বসে। সবুজ কালিতে। মন্ত্রীদের সবুজ কালি ব্যবহার নিষিদ্ধ। বার্লিন বাংকারে এতো দরকারী ঐতিহাসিক দলিল আর কখনো হিটলার পায়নি। হিটলারের অন্তরঙ্গদের মধ্যে একমাত্র স্পীয়ারেরই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়ার মতো বিদ্যাবুদ্ধি ছিল। মেমোটার ড্রাফট্ করে স্পীয়ার একটা কপি পেপারের পিছনে। মাসখানেক আগে ডক্টর লিসেনের একটা চিঠি থেকে ওর সেক্রেটারী মাইন্ ক্যাম্পের দুটো প্যারাগ্রাফ টাইপ করেছিল। স্পীয়ার হিটলারকে লেখে ঃ

আগামী চার থেকে আট সপ্তাহের মধ্যেই জার্মান অর্থনীতি নিশ্চিতভাবে ধ্বসে পড়বে। অর্থনীতির সেই ধ্বংসের পরে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া আর সম্ভব নয়। তাই যে কোন উপায়েই হোক, আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে জাতিকে এই ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো। তাই যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার কোন অধিকারই আমাদের আর নেই। আমাদের শত্রুপক্ষ যদি জার্মান জাতিকে ধ্বংস করে, যে জাতি এতো দীর্ঘদিন ধরে বীরের মতো যুদ্ধ করে এসেছে, তবে ইতিহাস তাদের ক্ষমা করবে না। তাই আমাদের উচিত জাতিকে এই যুদ্ধের বন্ধন থেকে এক্ষুণি মুক্তি দেওয়া, যাতে তারা আবার তাদের দূর ভবিষ্যতে গড়ে তুলতে পারে।

পরের পনেরো দিন স্পীয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে অন্য সবাইকে দলে টানতে। স্পীয়ার জানে খারাপ মুডের সময় হিটলারের হাতে এই মেমো পড়লে ওর জন্যে শুধু ভর্ৎসনাই জুটবে না, গৃহবন্দীও হতে পারে। কারণ এই সপ্তাহেই চারজন অফিসার রেমাগেনে রাইখের ওপরের সেতু উড়িয়ে দিতে অস্বীকার করলে তাদের গুলি করে মারা হয়। বাংকারে খবরাখবরের জন্য স্পীয়ার নির্ভর করতো এয়ারফোর্সের কর্নেল নিকোলাউস্ ভন বেলোর ওপরে। কর্নেল বেলো ছিল বুদ্ধিমান এবং সাহসী। ১৯০৮ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত রাইখ্‌মার্শাল গোয়েরিংয়ের ফ্যুয়েরার হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে

যোগাযোগকারী হিসেবে কাজ করেছে। স্পীয়ারের হয়েও এই একই কাজ করছে বর্তমানে কর্নেল। স্পীয়ার ভন বেলোকে টাইপ করা এক কপি মেমোরেনডাম দিয়ে তা হিটলারের মেজাজ বুঝে পড়ে শোনাতে বলে। সন্দেহ নেই, অভিজ্ঞ কর্নেল এই কাজ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গেই যথাসময়ে করেছিল।

স্পীয়ারের জন্মদিনের তারিখ হলো ১৯শে মার্চ। হিটলার তার অতি পরিচিতদের জন্মদিনে রূপোর ফ্রেমে বাঁধানো সোনার অক্ষরে স্বস্তিকা চিহ্নসহ নিজের ছবি উপহার দিতো। যার ভাগ্যে জুটতো, গর্বের সঙ্গেই পুরস্কার হিসেবে জিনিসটাকে গ্রহণ করতো। স্পীয়ারও এই রকমের একটা ছবির জন্য হিটলারের ব্যক্তিগত এডজুটান্ট এস এস মেজর জেনারেল জুলিয়াস শাউবকে বলেছিল।

১৮ই মার্চ স্পীয়ার বাংকারে গেলে হিটলারকে খোসমেজাজেই দেখতে পায়। কিন্তু রুটিন মাফিক কনফারেন্সে বসেই হিটলারের মেজাজ বিগড়ায়। সেদিনের কথাবার্তা ছিল জেনারেল জর্জ এস প্যাটন, থার্ড আর্মির সারে এবং প্যালাটিনেট, রাইন এবং মেইন নদীব অববাহিকার এই অঞ্চলের বিপর্যয় নিয়ে।

আলোচনার সময় হিটলার স্পীয়ারকে জিজ্ঞাসা করে,—স্পীয়াব, সারে হাতছাড়া হওয়াতে আমাদের অস্ত্র উৎপাদনের কতোটা ক্ষতি হবে বলে মনে করো?

—অনিবার্য ধ্বংসটা ত্বরান্বিত হওয়া ছাড়া আর কিছু তো আমার মনে হয় না।

উপস্থিত সবাই ফ্যুয়েরারের মুখের ওপর ওর উত্তরের ধরনে চমকে ওঠে; আলোচনা সভায় হঠাৎ কবরের নিস্তব্ধতা নেমে আসে। হিটলার কিন্তু স্পীয়ারের উত্তরটাকে গায়ে মাখে না। তবে কনফারেন্স ভাঙার আগে হিটলার নীরোর স্টাইলে একটা আদেশ জারী করে। রাইনের পশ্চিম পাড়ের সমস্ত জার্মানদের এক্ষুণি সরে আসতে হবে। প্রায় আশী লক্ষ জার্মানের ভাগ্য মুহূর্তে নির্দ্ধারিত হয়ে যায়। ফিল্ড মার্শাল

কাইটেল কোনরকম প্রতিবাদ ছাড়াই ফ্যুয়েরারের এই আদেশের খসড়া তৈরী করে। যুদ্ধ চলাকালীন এই ধরনের ইভাকুয়েসানে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু হবে।

রাত দু'টো নাগাদ কনফারেন্স ভাঙ্গে। মার্চ মাসের ১৯ তারিখ। স্পীয়ারের চল্লিশতম জন্মদিন। কনফারেন্সের আগে স্পীয়ার ভেবেছিল উড়ে যাবে কনিংগবার্গে। কিন্তু কনফারেন্সের শেষে মত বদলায়। উল্টোদিকে যাবে বলে মন স্থির করে। প্যালাটিনেটে। কারণ প্যালাটিনেটের মাথার ওপরে পোড়ামাটি নীতি আর গণ ইভাকুয়েসানের খাঁড়া ঝুলছে। ১৫ই মার্চ তারিখে লেখা মেমোরেনডামটা হাতে তুলে দিতে এবং ওর জন্মদিনের উপহার নেওয়ার জন্য স্পীয়ার হিটলারের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে। হয়তো বা এটাই দু'জনের শেষ সাক্ষাৎ। কে বলতে পারে?

১৯৩৩ সালে মিউনিকের প্রিনজ্ রেগনেন ষ্ট্রাসেতে প্রথম হিটলারের সঙ্গে স্পীয়ারের দেখা হয়েছিল। স্পীয়ারের বয়েস তখন আঠাশ; আর হিটলারের পঁয়তাল্লিশ। সুদর্শন কিন্তু লাজুক আর্কিটেক্‌ট্ স্পীয়ার কয়েকটা ডিজাইনের নক্‌শা স্কেচ করে নিয়ে হিটলারকে দেখাতে এনেছিল। পার্টি র‍্যালিতে সাজানোর জন্য। ঠিক সেই সময় হিটলার একা একা বসে রিভলবার পরিষ্কার করছিল। হিটলার স্কেচগুলো পছন্দ না হওয়াতে ওর হাতে ফিরিয়ে দিয়েছিল কোন কথা না বলে। কিন্তু সেই মুহূর্তে সুদর্শন যোসেপ যেন ফারাওয়ের দেখা পেয়ে গিয়েছিল। সেই দু'জনেই আজ পরস্পর মুখোমুখি বাংকারে বসে। একটা অটোগ্রাফ করা ছবির জন্য। দু'সপ্তাহ আগে এই ব্রুটাসই বাংকারের বাইরে দাঁড়িয়ে কী করে বাংকারের ভেতরে মাসটারড্ গ্যাস ঢুকিয়ে সীজারকে হত্যা করা যায় সেই চিন্তাতে বিভোর ছিল।

হিটলার টেলিফোন করে ওর পরিচারককে ফ্রেমসুদ্ধ নিজের ছবি আনতে আদেশ দেয়। পরিচারক ছবি আনলে কাঁপা হাতে তা স্পীয়ারকে দেয় হিটলার। ওর কাঁচের মতো ঝকঝকে চোখ দুটোয়

জল টল টল করে। ইদানিং হাইনিজ লিঙে দিনের মধ্যে বেশ কয়েকবার ফ্যুয়েরারকে কোকাইন ড্রপ দিতো। হিটলার ওর হাতে ছবিটা দিতে গিয়ে বিড় বিড় করে কিছু একটা বলে। স্পীয়ার স্পষ্ট বুঝতে পারে না। ছবিটা একটা চামড়ার খাপে মোড়া। স্পীয়ার নামিয়ে হিটলারের ডেস্কের ওপরে রাখে। নিকেলের চশমার আড়ালে হিটলার আবার জড়ানো গলায় কিছুটা ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গীতেই বলে, —জানো, ইদানিং আমার পক্ষে লেখাপড়া করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন কি নিজের হাতে কয়েকটা অক্ষরও লিখে উঠতে পারি না। কাঁপে। প্রায়ই আমার নিজের স্বাক্ষরটাও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ছবিতে তোমার জন্য যা লিখেছি, তা' পড়তে তুমি পারবে না জানি। কারণ দুর্বোধ্য।

হ্যাপি বার্থ-ডে এবং অতীতের স্মৃতির কথা তুললে পরে স্পীয়ার বুঝতে পারে হিটলার ওকে ছবিটা খুলতে বলছে। ছবিটার হাতের লেখা চেনা না থাকলে হিটলারের বলে বোঝা অসম্ভব। আর্কিটেকট্ এবং যুদ্ধ-মন্ত্রী হিসেবে ওর কাজের প্রতি হিটলার সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছে। অতীতের স্মৃতি উভয়ের কাছেই মধুর। বার্গহোফের ছাদে জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে দাঁড়িয়ে দু'জনে দেখতো পাহাড়ের নীচের গ্রামগুলো চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে। গ্রামের লোকেরা সমবেত স্বরে গান গাইছে। অনেকটা উপাসনার ভঙ্গীতে। হিটলার আর স্পীয়ার দুজনেই তখন আধুনিক পুরুষ; কুসংস্কার মুক্ত। সেই ভেসে যাওয়া চাঁদের আলোয় ছাদে দাঁড়িয়ে উভয়ে পরিকল্পনা করতো বার্লিন ডোমের। সেন্ট পিটারের থেকে পরিধিতে সাতগুণ বড় সেই ডোম। আর এখন? যে ঘরে দাঁড়িয়ে ওরা কথা বলছে তার মাপ বড়জোর দশ ফুট বাই পনেরো ফুট হবে।

এই মুহূর্তে হিটলারের স্পীয়ারের প্রতি অন্তরঙ্গতায় এতোটুকু খাদ নেই। স্পীয়ারও স্বপ্ন দেখে লিনৎসে, ডানিয়ুবের পাড় ধরে লাম্বার্ডি পপ্লারের ছায়ায় হিটলারের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ক্যালিক্রেটস্ এবং ফিদাস, ভিয়েনার রিঙ্, ষ্ট্রাসের গারিনিয়ারের প্যারিস

অপেরা নিয়ে আলোচনা কতো সুখপ্রদ। হিটলারও হয়তো বা সেই মুহূর্তে স্বপ্ন দেখছিল। যে লোকটা কিছুক্ষণ আগে নিজে মুখে বলেছে, থার্ড রাইখ্ প্রায় কবরের কাছাকাছি এসে পড়েছে, সে-ই আবার ওর কাছে ছবি চাইছে। হয়তো বা হিটলার ইতিমধ্যে স্পীয়ারের ১৫ই মার্চের মেমোরেনডাম পড়েছে। হয়তো বা পড়ে নি। কিন্তু ওর মন চাইছে ঠিক এই মুহূর্তে বাস্তব থেকে মুক্তি পেতে। স্পীয়ার একটা ব্লু-প্রিন্ট সঙ্গে করে আনলে হয়তো বা সারারাত ধরে তা' নিয়ে আলোচনা করতো হিটলার। ভুলে যেতো থার্ড রাইখের এই সংকটময় বর্তমান অবস্থা।

স্পীয়ার পরে স্বীকার করেছে, সেই মুহূর্তে হিটলারের চেয়েও ওর মন আচ্ছন্ন হয়েছিল স্খলিতপদে ঘর বাড়ী ছেড়ে যাওয়া উদ্বাস্তু, খালি পায়ে বরফের ওপর দিয়ে হাঁটা স্কুলের ছেলেমেয়েরা, ড্রেসডেনের ধ্বংসাবশেষ, বোমাবর্ষণে ক্ষতবিক্ষত অটোবান; বিশৃঙ্খল বুণ্ডেসবান বা জার্মান রেলওয়েজ। নিত্য প্রয়োজনীয় দোকানের সামনে দাঁড়ানো বিরাট মানুষের মিছিল।

এরপর স্পীয়ার মেমোরেনডামটা হিটলারের হাতে দেয়। তারপর কবরের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে ফ্যুয়েরারকে জানায় যে ওর প্ল্যান ও ইতিমধ্যে পরিবর্তন করেছে। কনিংসবার্গ যাওয়ার পরিবর্তে ও যাবে জার্মানীর পশ্চিম রণাঙ্গনে। মোটরযোগে। কথাক'টা শেষ করে স্পীয়ার ফ্যুয়েরারের অফিস ছেড়ে যায়।

তবে স্পীয়ার তখনো বাংকার ছাড়ে নি। নিজের গাড়ী আর সোফেয়ারকে ডেকেছে মাত্র। হিটলার আবার ওকে ডেকে পাঠিয়ে বলে,—ব্যাপারটা নিয়ে আমি চিন্তা করলাম। আমার গাড়ী আর সোফেয়ার খেমকা তোমাকে নিয়ে যাবে।

স্পীয়ারের উদ্দেশ্য বুঝতে খুব বেশী একটা সময় লাগে নি। হিটলারের মিলিটারী কনফারেন্সে ওর কথাবার্তার ধরনেই বুঝতে পেরে গেছে যে স্পায়ার রাইনল্যাণ্ড এবং প্যালেটিনেটে যেতে চাইছে শিল্পগুলোকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে। নিজের গাড়ী

এবং সোফেয়ার ওকে ব্যবহার করতে বলেছিল যাতে বাংকার এবং বার্লিনের বাইরেও স্পীয়ারের কার্যকলাপকে হিটলার আয়ত্তে রাখতে পারে। মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে হিটলার নিজের সোফেয়ার এরিখ খেমকাকে নিযুক্ত করেছিল স্রেফ গোয়েন্দাগিরি করবার জন্য। স্পীয়ার কিন্তু ব্যাপারটাকে সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিয়ে প্রতিবাদ জানায়। তারপর হিটলারের সঙ্গে একটা সামঝাতায় আসে। স্পীয়ার ওর গাড়ী আর সোফেয়ার নিয়েই যাবে। তবে খেমকাকে ওর সোফেয়ারের সঙ্গী হিসেবে নিতে হবে।

বাংকারের পরিবেশ ইতিমধ্যে বরফ শীতল হয়ে দাঁড়িয়েছে। জন্ম-দিনের উষ্ণ আবহাওয়া অন্তহিত। হিটলারের মন মেজাজও বিশ্রী ধরনের রূঢ় হয়ে ওঠে। হিটলার কর্কশস্বরেই ওকে উদ্দেশ্য করে বলে, এইবার আমি তোমার ১৫ই মার্চ তারিখের মেমোরেনডামের লিখিত উত্তর দেবো।

এরপরেই হিটলার রাগে ফেটে পড়ে বলে,—যুদ্ধে হেরে গেলে এই মানুষগুলোরও বেঁচে থাকার প্রয়োজন দেখি না। সুতরাং এদের বেঁচে থাকার প্রশ্নটাই নিরর্থক। তাই এদের ধ্বংসের যথেষ্ট প্রয়োজনও রয়েছে। জাতি তাহলে দুর্বল বলে প্রমাণিত। ভবিষ্যৎ বলশালী পূর্ব দেশীয় জাতির জন্য যুদ্ধের পরে হীন-রাই বেঁচে থাকবে; কারণ শ্রেষ্ঠ জার্মানরা ইতিমধ্যে যুদ্ধে নিহত।

পঁচিশ বছর পরেও স্পীয়ারের মনে হয় কথাগুলো তখনো সমানে ওর কানের কাছে বেজে চলেছে। বরফ কঠিন শীতল একটা কণ্ঠস্বর। স্পীয়ারের সঙ্গে বেরতে পেরে খেমকাও খুসী হয়। রাতের বার্লিনের হাওয়ায় প্রথম বসন্তের ছোঁয়া। বাংকারের বদ্ধ আবহাওয়ার থেকে বেরিয়ে বুক ভরে নিশ্বাস নেয় সবাই। এস এস পার্টিতে খেমকার জায়গা ছিল কর্নেলের। গত তিন মাসে খুব বেশী হলে মাত্র পাঁচ ছ'বার ফ্যুয়েরারকে গাড়ীতে নিয়ে ড্রাইভ করেছে খেমকা।

খেমকা ও স্পীয়ারের মধ্যে মাত্র দু'টো ব্যাপারে মিল ছিল; তা হলো ফ্যুয়েরারের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং দ্রুতবেগে গাড়ী

চালানো। স্পীয়ার নিজের গাড়ী নিজেই চালায়। গাড়ীটা হলো ছয় সিলিণ্ডারের বি এম ডবলু; পাশের সিটে খেমকা। আর পেছনের সীটে বসে সম্ভ্রান্ত যুবক কর্নেল ম্যানফ্রেড ভন পোজার। বার্লিন থেকে অটোবান ধরে ব্যাড্ নয়িহামের দিকে রওনা হয় তিনজন। মাঝপথে রয়াল এয়ারফোর্স মসকিটো বোম্বার হানা দিলে রাস্তার পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বাড্ নয়িহামে এসে পৌঁছায় সকাল গোটা ন'য়েক নাগাদ।

তখন পশ্চিম রণাঙ্গনের কমাণ্ডার-ইন-চীফ হলো ফিল্ড মার্শাল কেসলরিঙ। কেসলরিঙকে ইতালি থেকে সরিয়ে এনে ভন রুণ্ডষ্টেডের জায়গায় বসানো হয়েছে। জিগেনবার্গে কেসলরিঙ তখন মদের টেবিলে মন্ত্রীর জন্মদিন পালনে ব্যস্ত। হঠাৎ ইউ এস নাইনথ ফোর্স বোমাবর্ষণ করতে সুরু করলে মর্টার ডাষ্টের মধ্যে পার্টি ফেলে দিয়ে সবাই ছোটে আশ্রয়ের খোঁজে। ১৯৩৯ সালে তৈরী আড্লার হোষ্ট বা ঈগলের বাসায়।

পরবর্তী আটচল্লিশ ঘণ্টা স্পীয়ারের কাটে ঝটিকা সফরে। জার্মানীর অনেক পরিমাণে জায়গা ওর সেই ঝটিকা সফরের অন্তর্গত হয়।

রাইনল্যাণ্ড বর্তমানে পশ্চিম রণাঙ্গন। প্যালাটিনেট; ওর জন্মস্থান নর্থ বাদেন। এবং বন শহরের কাছাকাছি রাইন নদী পেরিয়ে ওপারের ওয়েষ্টার ভাল্ড। এমন কি আমেরিকানদের হাতে পড়ার আগে হাইডেলবার্গে বাবা মা'র কাছে গিয়েও ঘুরে আসে। প্রত্যেক জায়গাতেই জেনারেল, প্ল্যাণ্ট ম্যানেজার, মেয়র এবং যতো লোক সম্ভব সবার সঙ্গেই কথা বলে আপ্রাণ চেষ্টা করে হিটলারের পোড়া-মাটি নীতি বিফল করার। হিটলার একরকম বার্লিনের বাংকারে বন্দী। সুতরাং প্রায় সবার সঙ্গেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। আর পশ্চিম রণাঙ্গনের মেজর থেকে আরম্ভ করে সাধারণ সৈনিক পর্যন্ত এই যুদ্ধের ব্যাপারে হতোদ্যম। ধরেই নিয়েছে যে এই যুদ্ধে ওদের পরাজয় সুনিশ্চিত। পূর্ব রণাঙ্গনে অবশ্য অবস্থা এতোটা খারাপ ছিল না। প্যালাটিনেটে জেনারেল প্যাটন বার্লিনের মার্টিন বোরম্যানের চেয়ে সাধারণ

জার্মানদের অনেক কাছাকাছি ছিল। তবে অস্বীকার করার উপায় নেই যে তখনো পর্যন্ত বোরম্যানের গাউলাউটারদের ওপরে কর্তৃত্ব বজায় ছিল। অবশ্য সেই বিশৃঙ্খল গাউলাউটারদের সুশৃঙ্খল করার আর উপায় ছিল না। ন্যাশানাল সোসালিষ্ট পার্টির অভিভাবক বলতে ছিল ওরাই। কিন্তু সেই অভিভাবকদের সঠিক পথে এখন আর কে চালনা করবে? নিঃসঙ্গ বার্লিনের পটভূমিকায় ফ্যুয়েরার ছিল আরো বেশী নিঃসঙ্গ।

জার্মানদের মধ্যে স্পীয়ারের তখন পর্যন্ত যেটুকু শ্রদ্ধা বা সম্ভ্রম বজায় ছিল বোরম্যানের তা ছিল না। শুধু গাউলাউটার ছাড়া। কারণ গাউলাউটাররা জানতো বোরম্যান হিটলারের কতো কাছের মানুষ, তবে স্পীয়ারের ক্ষমতা ছিল বাংকারের বাইরে। হিটলারের পোড়ামাটি নীতি কিন্তু পশ্চিম রণাঙ্গনে মোটেই কার্যকর হয় নি। স্পীয়ার মাইন্জ শহরে তিনজন গাউলাউটারের সঙ্গে দেখা করলে তারা জানায় যে পোড়ামাটি নীতি কার্যকরী করার পক্ষে এখন অনেক দেরী হয়ে গেছে।

আসলে প্রয়োজনীয় যুদ্ধের উপকরণ উৎপাদনের কারখানায়, কারখানা অধ্যুষিত শহরগুলোতে স্পীয়ারের নিজের লোক থাকায় এই পোড়ামাটি নীতি কার্যকরী করার ব্যাপারে, স্পীয়ার বোরম্যানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিতে সমর্থ হয়েছিল।

তবে ভেস্টারভেল্ডে ফিল্ড মার্শাল মডেলের হেড কোয়ার্টারে থাকার সময়েই ওর ১৫ই মার্চের মেমোর উত্তরে পোড়ামাটি নীতি কার্যকরী করার ব্যাপারে হিটলার স্পীয়ারের সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নেয়। সেই অধিকার পরিপূর্ণভাবে বোরম্যানের হাতে ন্যস্ত করা হয়। গাউলাউটার সাহায্যে সেই নীতি কার্যকরী করার জন্য।

বোরম্যান প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা করে হিটলারের পোড়ামাটি নীতি কার্যকরী করার। কারখানাগুলোকে ধূলিসাৎ না করলেও জল-সরবরাহ, টেলিফোন, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। গ্যাস বা বৈদ্যুতিক সরবরাহ ব্যবস্থাও রাখা হয় না। রুড় অঞ্চল

শুধু জার্মানীরই নয়, পৃথিবীর মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে ঘন ইন্‌ডাসট্রিয়াল কমপ্লেক্স। স্পীয়ার বোঝে যে দেশকে মধ্যযুগীয় অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে।

ঘুরতে ঘুরতে স্পীয়ার আসে ওয়েষ্টার ভাল্‌ডে। রুড় অঞ্চলের দক্ষিণে এবং রাইনের পুবে এই ওয়েষ্টার ভাল্‌ড। আকাশের দিকে মাথা উঁচু করা সাজানো গাছগাছালি আর ঘন সবুজ ঘাসের কার্পেটে মোড়া এই অঞ্চলের ছোট ছোট পাহাড় এবং টিলাগুলো। বেথোভেন যৌবনে অনেক সময় এইখানের জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছে। ২০শে মার্চের হিটলারের আদেশ হাতে পাওয়ার পর স্পীয়ার প্রথমে দীর্ঘ ভ্রমণে বের হয়। শীত তখন যুদ্ধের মতোই দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। বসন্ত হাওয়ায় ইতিমধ্যেই হাত রেখেছে। ফোরনিয়াস ফুটেছে, উইলো গাছে সবুজের বন্যা। ক্লান্ত বিষণ্ণ স্পীয়ার এক পরিচিত বর্দ্ধিষ্ণু চাষীর ঘরে এসে হাজির হয়। মনের ভারে ওর চোখহু'টো তখন গভীর ঘুমে ভেঙ্গে আসছে। পাহাড়ের মাথায় চাষীর ঘর। নীচের গ্রামটাকে তখন কুয়াশায় জড়ানো বসন্তের সূর্যরশ্মি ঘিরে ধরেছে। দূরে, বহুদূরে সাওয়ারল্যাণ্ড। সিগ্ আর রুড় নদীর মাঝখানে। এতো সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যকে কীভাবে মরুভূমিতে পরিণত করবো? মনে মনে এই একটা চিন্তাই উথালিপাথালি করে স্পীয়ারের। বাতাসে দুলতে থাকা ফার্ণের ছোট ছোট ঝোপঝাড়ের মধ্যেই শুয়ে পড়ে স্পীয়ার। মাটিতে মশলার গন্ধ। আসলে বসন্তের সমাগমে গাছগাছালির শিকড়গুলো মাটির ওপরে ঠেলে উঠতে চেষ্টা করছে। ধীরে ধীরে স্পীয়ার চাষীর বাড়ীতে ফিরে আসে। মনে মনে স্থির করে ওর এইসময় বার্লিন যাওয়াটা একান্ত প্রয়োজনীয়।

জার্মান রোমান্টিসিজমের শেষ সুর তখনো অ্যালবার্ট স্পীয়ারের মনে সমানে আঘাত করে চলেছে। অটোভান ধরে ঘণ্টা সাতেক সমানে গাড়ী চালিয়ে স্পীয়ার বার্লিনে ফিরে আসে। বসন্ত ঋতুর প্রথম দিন সেটা। হিটলার ডেকে পাঠালেও স্পীয়ার বাংকারে যায় না। সহকারী কার্ল সাউয়ারকে পাঠিয়ে দেয়। কারণ ও ভালোভাবেই

জানে ফ্যুয়েরারের যা খবর নেওয়ার তা ড্রাইভার খেমকার কাছ থেকে ইতিমধ্যেই নিয়ে নিয়েছে। হিটলার অবশ্য কার্লের সঙ্গে সেদিন গ্রীক-ফায়ার নিয়ে আলোচনা করে। গ্রীক-ফায়ার হলো খ্রীষ্টপূর্ব ছ'শো অষ্টআশী অব্দে হেলিওপোলিসের ক্যালিনুকুসের আবিষ্কৃত অত্যাশ্চর্য আগুনে একটা অস্ত্র।

২৪শে মার্চ ফিল্ড মার্শাল মণ্টগোমারীর নেতৃত্বে টুয়েন্টি ফার্ষ্ট আর্মি গ্রুপ ভাসেলের কাছে রাইন নদী পেরিয়ে এপারে আসে। রুড়ের উত্তরে হলো ভাসেল্। স্পীয়ার খবর পেয়ে বার্লিন ছেড়ে তৎক্ষণাৎ রুড়ে এসে হাজির হয়। এইখান থেকেই একদিন রাইখের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল। ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষি মিত্রশক্তির মিলিত বাহিনী যখন সিগ্‌ফ্রিড লাইন এবং ওয়েষ্ট ওয়ালে পৌঁছে গিয়েছিল, তখনো পর্যন্ত রুড় অঞ্চলের কলকারখানায় পুরো উদ্যমে অস্ত্রশস্ত্র তৈরী হয়ে চলেছে। বলাবাহুল্য রুড় অঞ্চল তখন মিত্রশক্তির বোমার-আঘাতে বিপর্য্যস্ত। পোড়ামাটি নীতি কার্যকরী করার ব্যাপারে হিটলার স্পীয়ারের সব ক্ষমতা কেড়ে নিলেও স্পীয়ার কৌশলে ব্যাপারটাতে বিলম্ব ঘটাতে সুরু করে। ২৫শে মার্চ এসেনের কাছে এক দুর্গ শ্লস্ লাণ্ডেসবার্গে রুড় অঞ্চলের কারখানাগুলোর প্রায় শতাধিক ম্যানেজারকে ডেকে পাঠায়। শ্লস্ ল্যাণ্ডেসবার্গ দুর্গটার মালিক ছিল ষ্টিল-কিং ব্যরণ ফ্রিটজ্ থাইসন। একদা হিটলারের অনুগামী হলেও পোলাণ্ড আক্রমণের ব্যাপারে প্রতিবাদ-টেলিগ্রাম পাঠানোয় ওকে দাচাওয়ের কনসেনট্রেসন ক্যাম্পে পাঠানো হয়। যাইহোক্, শ্লসের জমায়েতে স্পীয়ার ম্যানেজারদের নির্দেশ দেয়, কয়লাখনির ডিনামাইট ব্লাসটিং ক্যাপ এবং ফিউজ্‌গুলোকে পরিত্যক্ত কোন খনির গর্ভে ছুঁড়ে ফেলার। প্রতিটি শ্রমিককে সাবমেশিনগান দিতে, যাতে গাউলাউটারদের নির্দেশে যারা পোড়ামাটি নীতি কার্যকরী করবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে। ট্রাকগুলোর সাহায্যে রুড় অঞ্চলের গ্যাসের সরবরাহ বজায় ব্যবস্থা রাখতে। ট্রাকগুলো তখন পর্যন্ত যুদ্ধ দপ্তরের অধীনে থাকায় স্পীয়ার এগুলোকে রুড় অঞ্চল রক্ষা করার কাজে নিয়োজিত করে।

স্পীয়ারের সব আদেশগুলো কার্যকরী করা হলে ব্যাপারটা রাইখের বিরুদ্ধে প্রায় বিদ্রোহের পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়।

বার্লিনে ফেরার আগে স্পীয়ার চট করে একবার দক্ষিণ ঘুরে যায়। বাদেনে আসে। স্পীয়ার যখন হাইডেলবার্গে তখন বার্লিন থেকে আদেশ আসে সমস্ত জলসরবরাহ ব্যবস্থা ডিনামাইটের সাহায্যে উড়িয়ে দিতে। স্পীয়ার অবশ্য সেই আদেশগুলোকে এমন সব অঞ্চলের ডাকবাক্সে ফেলতে বলে, যেসব অঞ্চল দু'একদিনের মধ্যে আমেরিকানদের অধীনে চলে যাবে। বার'দুয়েক তো আমেরিকানদের হাতে বন্দী হতে হতে বেঁচে যায় স্পীয়ার। নেহাৎ ছোটবেলায় হাইডেলবার্গের রাস্তাঘাট ভালো রকম চেনাজানা ছিল বলেই।

পরের দিন মাঝরাত্তিরে স্পীয়ার বার্লিনে ফিরে আসে। একনাগাড়ে দীর্ঘ সময় গাড়ী চালিয়ে শরীর এবং মন উভয়ই ওর তখন ক্লান্ত। বাংকারে ওর সবচেয়ে বিশ্বস্ত কর্নেল ভন বেলোর কাছ থেকে জানতে পারে জেনারেল গুডারিয়ানকে ফ্যুয়েরার পদত্যাগে বাধ্য করেছে। গুডারিয়ানের মাধ্যমেই বাংকারের খবরাখবর পেতো স্পীয়ার। হিটলার মাঝরাতের কনফারেন্স শেষ করে একলা কথা বলার জন্য ডেকে পাঠায় ওকে। স্পীয়ার হাজির হলে সোজাসুজি প্রসঙ্গ তুলে জিজ্ঞাসা করে,—বোরম্যান আমাকে তোমার সঙ্গে গাউলাউটারদের মিটিংয়ের রিপোর্ট দিয়েছে। তুমি নাকি ওদের বলেছো যে যুদ্ধ শেষ; সুতরাং পোড়ামাটি সম্পর্কে আমার দেওয়া আদেশ যেন আর কার্যকরী করা না হয়। তুমি জানো এর কি পরিণতি হতে পারে?

স্পীয়ারের জায়গায় যদি অন্য কেউ হ'তো তবে নিশ্চিত গুলির মুখে অথবা ফাঁসির দড়িতে জীবনটাকে দিতে হ'তো। অথবা, হিটলার যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারতো বাংকারে বিষাক্ত গ্যাস ঢোকানোর ব্যাপারটা, তবে তো আর রক্ষে ছিল না। যাইহোক, কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে হিটলার বলে,—তুমি যদি আমার আর্কিটেক্ট না হ'তে, তবে এই ব্যাপারে যা করা উচিত—তাই করতাম।

স্পীয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দেয়,—যা ঠিক বুঝবেন সেই শাস্তিই

আমাকে দিন। আর্কিটেক্‌ট্‌ হিসেবে কোন স্ুবিধে আমি চাই না।

হিটলার শান্তভাবে বলে,—স্পীয়ার, অতিরিক্ত পরিশ্রমে তুমি ক্লান্ত। সুতরাং আমি চাই এক্ষুণি তুমি বিশ্রাম করতে যাও।

কয়েক ঘণ্টা আগে গুডারিয়ানকেও হিটলার এই এক কথাই বলেছে।

হিটলারের কথায় তবু জায়গা ছেড়ে ওঠে না স্পীয়ার। বলে,—না, না, আমার শরীর এবং মন ঠিকই আছে। যদি আমাকে মন্ত্রী হিসেবে না চান, তবে বাতিল করে দিন। একজনে আমার জায়গায় কাজ করবে, আর মন্ত্রীত্বের দায় বয়ে বেড়াবো আমি, তা আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। না, কখনোই এটা হতে পারে না ফ্যুয়েরার।

এরপরেই নেমে আসে নীরবতার একটা দীর্ঘ পর্দা। দু'জনেই নিশ্চুপে বসে থাকে। কিছুক্ষণ পরে সেই নীরবতা ভেঙ্গে হিটলার বলে,—স্পীয়ার, যদি তুমি তোমার মনকে বোঝাতে পারো যে যুদ্ধে আমরা হারিনি, তবে আবার তোমার ওপরে ন্যস্ত দায়িত্ব তুমি ঠিকমতো বইতে পারবে।

অনুরোধটা যে শূন্যগর্ভ তাতে সন্দেহ নেই।

স্পীয়ার নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে শান্ত গলাতে বলে,—দেখুন, আমি নিজের মনকে মিথ্যে প্রবোধ দিতে পারবো না। যুদ্ধে আমরা সত্যি হেরে গেছি।

হেরে গেছি—শব্দটাকেই হিটলার সহ্য করতে পারে না।

স্পীয়ার আগেও বহুবার নরম গলায় হিটলারকে সতর্ক করে দিয়েছে যে কতোগুলো মাথামোটা গর্দভ ওকে ঘিরে রয়েছে। যারা কিছুতেই সত্যটাকে তুলে ধরতে চায় না। ফাঁসির দড়ি চোখের সামনে ঝুলছে জেনেও স্পীয়ার বলে, ফ্যুয়েরার, আপনার খোঁয়াড়ের অনেক শুয়োরের মতো জিতব না জেনেও আমার পক্ষে মিথ্যা বলা সম্ভব নয় যে আমরা জিতেছি। বলাবাহুল্য, জার্মান ভাষায় শুয়োর শব্দটা যথেষ্ট নক্কারজনক। তবে হিটলার জানে স্পীয়ার শব্দটা ওর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে নি। করেছে, গোয়েবেলস্, বোরম্যান এদের উদ্দেশ্যে। সুতরাং ইচ্ছে করেই কানে তোলে না শব্দটাকে।

তুমি কি বিশ্বাস করো যে যুদ্ধ আমরা এখনও চালিয়ে যেতে পারবো ? হিটলার ওকে প্রশ্ন করে।

স্পীয়ার কোন উত্তর দেয় না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হিটলার বলে,—স্পীয়ার, তোমাকে এর উত্তর ভেবে দেখার জন্য চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিলাম। আগামী কাল আমাকে জানাবে—যুদ্ধে এখনো আমাদের যে জেতার সম্ভাবনা আছে তা তুমি বিশ্বাস্ করো কিনা।

ঘড়ির কাঁটা ঘণ্টাখানেক হলো মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। হ্যাণ্ডসেক্ না করেই স্পীয়ার বাংকার ছেড়ে বেরিয়ে আসে। হিটলারের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্পীয়ারের সমস্ত শরীর তখন ভেঙ্গে পড়ছে। শহর বার্লিনে মাঝরাতের নিস্তব্ধতা নেমেছে। বিরাট বড় সুগোল চাঁদটা আকাশের কপালে জ্বলজ্বল করছে। স্পীয়ার বুঝে উঠতে পারে না এমন্ ঝকঝকে পরিষ্কার আকাশ, তবু, রয়াল এয়ারফোর্স কেন এখনো বার্লিনের ওপরে হানা দিচ্ছে না। জনশূন্য উইলহেলম্ ষ্ট্রীট দিয়ে গাড়ী চালিয়ে স্পীয়ার ওর দপ্তরের নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে আসে। ঘুমোতে চেষ্টা করলেও ঘুম আসে না চোখে। খাটের এক কোণে বসে হিটলারের উদ্দেশ্যে এক দীর্ঘ চিঠি লিখতে সুরু করে। চব্বিশ পাতার চিঠি। মিঠে কড়া ভাষায় মেশানো। কিছুটা দার্শনিকও বটে। চিঠিটায় বিশেষভাবে লেখা হয়েছে কি ভাবে এবং কি কারণে জার্মানী এই যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে। চিঠির শেষ বক্তব্যে হিটলারকে পোড়ামাটি নীতি বর্জন করতে অনুরোধ জানায়।

ভোর সকালের দিকে স্পীয়ার ঘুমিয়ে পড়েছিল। উঠে দেখে অপরাহ্নের পড়ন্ত বেলা। ফ্যুয়েরারের জন্য বিশেষ ব্লক টাইপ রাইটারে টাইপ করার জন্য হিটলারের সিনিয়ার সেক্রেটারী জোহানা ওলফের কাছে পাঠিয়ে দেয়। হিটলার অবশ্য ওর চিন্তাধারা ইতিমধ্যে আঁচ করে নিয়ে সেক্রেটারীকে চিঠিটা টাইপ করতে বারণ করে স্পীয়ারকে ডেকে পাঠায়।

আবার সেই জনশূন্য মাঝ রাত্তির। স্পীয়ার এসে বাংকারে ঢোকে। হিটলার যখন কঠোর হয়, তখন হ্যাণ্ডসেক করে না। এবারেও

তার ব্যতিক্রম হয় না। ওকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলে,
—ওয়েল ?

—ফ্যুয়েরার আমি সব সময় আপনার পেছনে আছি।

কথাটা হঠাৎ আত্মসমর্পনের মতো শোনায়। মুহূর্ত কয়েক ফ্যুয়েরার কোন উত্তর দিতে পারে না। ধীরে ধীরে কাঁপা হাতটা তুলে স্পীয়ারের সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করে। চোখের তারায় কৃতজ্ঞতার আভাস। তারপর বলে,—যাই হোক। সবই তা'হলে ভালো। অতীতের বিষাদময় দিনগুলোর যেন ছায়া পড়ে। স্পীয়ার পোজার খেলোয়াড়দের মতো হারানো কার্ডটা আবার ফিরে চায়,—ফ্যুয়েরার, আমি যখন আপনার পেছনে দাঁড়ানো তখন আপনার পোড়ামাটি নীতি কার্যকরী করার ব্যাপারে গাউলাউটারদের থেকে আমাকেই আপনার বেশী বিশ্বাস করা উচিত।

শেষমেষ স্পীয়ার হিটলারকে বোঝাতে সমর্থ হয় যে পোড়ামাটি নীতি রাশিয়ার মতো সুবিশাল ভূখণ্ডে কার্যকরী হলেও জার্মানীর মতো ছোট্ট দেশে এই নীতির কোন ভূমিকাই নেই।

। চার

১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসটা নিষ্ঠুর হয়ে দেখা দেয় শহর বার্লিনের কাছে। ২৩শে এপ্রিল শহর বার্লিনকে শেষ রক্ষার চেষ্টায় এক প্ল্যান ছকা হয়। অপারেশন ক্লাউসভিৎজ। অত্যন্ত দুর্বল এই পরিকল্পনা। ২৩শে এপ্রিল সোমবার বিকেলে মেজর জেনারেল উইলহেলম্ মংকের নেতৃত্বে প্রায় দু'হাজার সশস্ত্র সৈন্য তাঁদের লিখ্টার ফেলডে্ ব্যারাক থেকে সাত মাইল হেঁটে নতুন রাইখ্ চ্যান্সেলারীতে এসে পৌছায়।

সপ্তাহ খানেক আগের এক ভোর সকালে ফাষ্ট উক্রানিয়ন আর্মি ফ্রন্ট মার্শাল গ্রেগরী জুকবের নেতৃত্বে ফ্রাংকফুর্ট এবং কুসৃষ্টিনের মাঝে ওডার নদী পার হয়। ঝড়ের গতিতে। দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রবাহিত নদী ওডার শহর বার্লিন থেকে মাত্র মাইল ষাটেক পুবে। রাশিয়ানরা এসেছে ভল্‌গা এবং ডন থেকে। নীপার এবং ভিশ্চুলা নদী পেরিয়ে। বর্তমানে পাঁচশো মাইল পথের শেষ বাধা ছিল ওডার নদী।

রাশিয়ানরা ওডার নদী অতিক্রম করায় শেষ বাধা সম্পর্কে যে তিরিশ লক্ষ বার্লিনবাসী এতোদিন বুক বেঁধে ছিল, রীতিমতো হতোদ্যম হয়ে পড়ে। মার্চ মাসে আমেরিকান আর ব্রিটিশ ফোর্স রাইন নদী পার হওয়ার পর থেকেই ওদের আসার প্রতীক্ষায় দিন গুণছিল। ১১ই এপ্রিল লেফ্‌টেনান্ট জেনারেল উইলিয়াম এইচ সিম্‌সনের নেতৃত্বে ইউ এস নাইনথ আর্মি মাগডেবুর্গে এলবে নদী পারও হয়েছিল। মাগডেবুর্গ বার্লিনের দক্ষিণ পশ্চিমে মাত্র নব্বুই মাইল দূরে।

বাংকারের সমরবিদরা জানে জার্মানীতে জার্মানদের পক্ষে কোন রকম বাধা দেওয়া আর সম্ভব নয়। সে রাশিয়ানই হোক বা মিত্রশক্তির সেনাবাহিনীই হোক। কেননা ওদের হিসেব মতো ইউ এস সেকেণ্ড আর্মড ডিভিশন এবং ইউ এস এইট্টি থার্ড ইনফেনট্রি ডিভিশন চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে বার্লিনে পৌঁছে যাবে। অর্থাৎ রাশিয়ানরা ওডার নদী পেরনোর দু'দিন আগেই। এরপরে তো আমেরিকানদের জন্য রাস্তা ফাঁকা।

১২ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার। দিনটা মেঘলা, গুমোট গরম। দুপুরের দিকে আমেরিকান সেকেণ্ড আরমারড্‌ ডিভিসান আর এইট্টি থার্ড ইনফেনট্রি ডিভিসন এলবে নদী পেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ নির্দেশ আসে আবার পিছু ফিরে নদীর এপারে চলে আসতে। আসলে ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৪৫ সালের মধ্য এপ্রিলে, শহর বার্লিন এবং মার্ক ব্রানডেনবুর্গে জার্মান মিলিটারীদের মধ্যে শৃঙ্খলা বলতে কিছু ছিল না। বাংকারের মধ্যে হিটলার তখন শেষ জার্মান

সৈনিক। শেষ কার্তুজ এবং শেষ দাঁড়িয়ে থাকা বাড়ীটা দিয়ে পর্যন্ত জার্মানীর রাজধানী শহর বার্লিনকে রক্ষায় তৎপর। অপরদিকে কয়েকজন ঠাণ্ডা মস্তিষ্কের জার্মান জেনারেল এবং ষ্টাফ, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জেনারেল গট্হার্ড হাইন্‌রিখি, ভিশ্চুলা আর্মি গ্রুপের শেষ জেনারেল তখন অন্য মতলব ভাঁজছিল। ফেসব জার্মান জেনারেল এবং উঁচু অফিসাররা হিটলারের আদেশকে রীতিমতো উপেক্ষা করে জার্মান সৈন্যদের প্রাণ বাঁচাতে চেষ্টা করে। তার ওপর হাজার হাজার জার্মান উদ্বাস্তু ভিটে মাটি ছেড়ে দিয়ে রাশিয়ানদের হাতে বন্দী হওয়ার ভয়ে ইংরেজ এবং আমেরিকান অধিকৃত অঞ্চলে সরে আসতে থাকে। ওদের মধ্যে বেশীর ভাগই মহিলা এবং শিশু। হাজারে হাজারে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে এপারে চলে আসে।

জেনারেল হাইনরিখি কাজটা খুব চালাকীর সঙ্গে সম্পাদনা করেছিল। আসলে পোকার খেলোয়াড়দের মতো মুখাবয়ব বিশিষ্ট এই জেনারেল সব সময় বাংকারে ফ্যুয়েরারের কাছে দ্ব্যর্থব্যঞ্জক কথায় তার কাজকর্মের রিপোর্ট পেশ করতো। তখন দুই ব্যাটালিয়ান জার্মান সৈন্য অর্থাৎ বার্লিনের পুবে জেনারেল বুসের অধীনে নাইনথ্ আর্মি আর শহরের পশ্চিমাঞ্চলে এবং এলবের পুবে টুয়েলভথ্ আর্মি জেনারেল ভেনেখের অধীনে রীতিমতো ফাঁদে আটকা পড়ে গেছে।

হিটলারের আদেশ উপেক্ষা করেই তাই জেনারেল হাইনরিখি জেনারেল ভেনেখকে বলে পশ্চিম ফ্রন্টে যুদ্ধ বন্ধ করে দিতে, এবং পূর্ব রণাঙ্গনে এগিয়ে গিয়ে জেনারেল বুসকে সাহায্য করে পশ্চিমদিকে এগিয়ে যেতে। এইভাবে হাইন্‌রিখি এমন একটা করিডর তৈরী করে দেয় যাতে দুই ব্যাটালিয়ান জার্মান সৈন্য এবং নাগরিকরা সেই করিডর ধরে শহর বার্লিনকে এড়িয়ে যেতে পারে। এর ফলে উত্তর এবং দক্ষিণে জনস্রোত জলের স্রোতের মতোই বইতে থাকে। এবং যথাসময়ে এই সুবিশাল জনস্রোত এলবে পেরিয়ে মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে। জেনারেল হাইনরিখির অবশ্য আশা ছিল যে এই করিডর ধরে আমেরিকানরাও সত্বর এগিয়ে আসবে। কিন্তু সম্ভবত এটা

জেনারেল হাইনরিখির পক্ষে দুরাশাই ছিল।

১২ই এপ্রিল, বৃহস্পতিবার বারবেলায় হঠাৎ আরেকটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট জর্জিয়ার ওয়ার্ম স্প্রিংয়ে মারা যায়। বিবিসি'র থেকে সেই খবর ধরা পড়ে বাংকারে রাত প্রায় এগারোটায়। হিটলার যখন মাঝরাতের কনফারেন্স সুরু করবে তার কিছুক্ষণ আগে। বাংকারে এই খবরে যেন উৎসবের বন্যা বয়ে যায়। তবে অল্পক্ষণ পরেই রয়াল এয়ারফোর্সের প্রচণ্ড বোমাবর্ষণে সেই উৎসবের উচ্ছ্বাস চাপা পড়ে। এই রাতেই বোমার আগুনে পুরনো রাইখ চ্যান্সেলারী এবং ফরেন অফিস ভস্মীভূত হয়।

যোসেপ গোয়েবেলস্ মাঝরাতের পরেই মোটর গাড়ীতে ওডার ফ্রন্ট পরিদর্শন সেরে নিজের বাড়ীতে ফিরে আসে। দরজার গোড়াতে খবরটা পেয়ে আনন্দে আত্মহারা। চোখ মুখ কিছুটা খুসীতে আর বাকীটা প্রজ্বলিত শহরের আলোয় উজ্জ্বল দেখায়। পাঁচটা বাড়ী পরেই বাংকারে হিটলারকে টেলিফোন করে বলে,—ফ্যুয়েরার, এটাই হলো ব্রানডেনবুর্গ হাউসের অলৌকিক ঘটনা। আপনার জন্ম কুণ্ডলিতে যে ঘটনার মোড়ের কথা বলা হয়েছে, এটা হলো সেই ঘটনা। বলাবাহুল্য, গোয়েবেলস্ অলৌকিক ঘটনা বলতে ১৭৫৯ সালের একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করেছে। আর হিটলার ছিল প্রচণ্ড রকমের জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাসী।

এখানে অলৌকিক ঘটনাটার একটু বিস্তারে আসা যাক। ফ্রেডরিক দ্য গ্রেট্, প্রুশিয়ার রাজা যুদ্ধে যখন হেরে যাওয়ার উপক্রম সেই সময় ১৭৬২ সালে হঠাৎ রাশিয়ার জারিনা এলিজাবেথ মারা যায়। সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ সাত বছর ব্যাপি যুদ্ধেরও পরিসমাপ্তি ঘটে।

গোয়েবেলস্ জানতো হিটলার মনে প্রাণে ফ্রেডরিক দ্য গ্রেটের পূজারী। পৃথিবীতে এই ফ্রেডরিককেই সম্ভবত হিটলার একমাত্র শ্রদ্ধা করতো। বৃষ্টির মতো রয়াল এয়ারফোর্সের বোমাবর্ষণের জন্যই গোয়েবেলস্ ব্যক্তিগতভাবে ফ্যুয়েরারের বাংকারে যেতে পারে নি।

এই টেলিফোনের উত্তরে হিটলার বলে যে সেও আশা করছে এই ঘটনার দরুণ চ্যান্সেলারীর ওপর দিয়ে আমেরিকান আর্মি এবং রেড-আর্মির গোলা ছুটবে। অর্থাৎ, ষ্টালিনের সঙ্গে মিত্রশক্তির সম্পর্ক এই ঘটনাই ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দেবে। কারণ হিটলার বিশ্বাস করতো ওর জন্ম কুণ্ডলিতে যা আছে, তা ফলবেই। শুধু সময়ের কিছুটা হেরফের হতে পারে।

এখানে বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে ১৯৩৩ সালের ৩০শে জানুয়ারী, অর্থাৎ যেদিন হিটলার জার্মানীর চ্যান্সেলার হয়, সেইদিন ওর একটা জন্মকুণ্ডলি তৈরী করা হয়েছিল। যাতে লেখা ছিল যুদ্ধ শুরু হবে ১৯৩৯ সালে, ১৯৪১ সাল পর্যন্ত হিটলার একটানা সেই যুদ্ধে জিতে যাবে, ১৯৪৫ সালের সুরুতে বেশ কিছু ফ্রণ্টে হিটলার বাহিনীর পর্যুদস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু সেই বছরের এপ্রিল মাসের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই হিটলারের বিরাটভাবে জয়লাভ।

পরের দিনই গোয়েবেলস্ রেডিওতে হিটলারের জন্মকুণ্ডলি প্রচারের ব্যবস্থা করে। কুসংস্কারের আরেকটা চমকপ্রদ উদাহরণ।

গোয়েবেলস্ জার্মানদের মনে বিশ্বাস আনার জন্য হিটলারের জন্ম কুণ্ডলি প্রচার করলেও নিজে কিন্তু এই সব ব্যাপার বিশ্বাস করতো না। ওদিকে মিত্রশক্তির সেনাবাহিনীর সুপ্রিম হেড কোয়ার্টার লণ্ডনে একজন জ্যোতিষীকে নিয়োগ করা হয়। তার প্রধান দায়িত্ব ছিল হিটলারের জন্মকুণ্ডলি সম্পর্কে জার্মান জ্যোতিষীর ভাষ্যের বিরোধিতা করা। গোয়েবেলস্ ইতিমধ্যে বিভিন্ন পত্র পত্রিকার সম্পাদকদের কাছ থেকে খোঁজখবর নিয়ে জেনেছে যে লক্ষ লক্ষ জার্মান এই সময় পত্রিকা খুললেই জ্যোতিষ বিভাগ পড়তো। আসলে যুদ্ধের গতিপথ, নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দুর্বলতাই ওদের তা' বাধ্য করতো। হিটলারের সঙ্গে টেলিফোনে কথা শেষ করে সেই রাতে গোয়েবেলস্ নিজের ষ্টাডিতে শ্যাম্পেন পার্টি দেয়। আর হিটলার প্রায় বাকী রাতটা ভিয়েনাতে টেলিফোন করে কাটায়। পরের দিন অর্থাৎ ১৩ই এপ্রিল ভিয়েনার পতন হয়। হিটলার ভিয়েনাকে ঘৃণা করলেও ঐতিহাসিক এবং

ভৌগোলিক দিক থেকে শহরটার গুরুত্ব যে অসীম তা' বুঝতো। ১৬৮৩ সালে এই কারণেই মরণ পণ বুঝে তুর্কীদের ভিয়েনা শহরের গেটের বাইরে ছুঁড়ে দেওয়া হয়। তখন সমগ্র পূর্ব ইউরোপে একমাত্র রাজধানী প্রাগ-ই ছিল জার্মান সেনাবাহিনীর দখলে।

* * * *

এবার দেখা যাক, এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি বার্লিনে যুদ্ধ শুরু হওয়ার একদিন আগে কারা কারা বার্লিন বাংকারে উপস্থিত ছিল? অনেকের কথা আগেই বলা হয়েছে; একে একে আরো অনেকে এসে বাংকারে ভিড জমায়। জোহানেস্ হানসেন জায়গা নেয় মেসিনরুমে। সার্জেন্ট মিখ্ সুইচবোর্ডের দায়িত্বে; একজনকে মাত্র তার সঙ্গে দেওয়া হয়—করপোরাল একস্ম্যান। অশ্বারোহী প্রহরী হিসেবে লেফটেনান্ট কর্ণেল ফ্রানজ্ শ্যাডেলের অধীনে নিযুক্ত করা হয় এফ বি কে'র তিরিশজন সদস্যকে। মেজর জেনারেল রাতেনহুবারকে চীফ সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে রাখা হয়। অধীনে প্রায় এক ডজন গোয়েন্দা। এস এস ইউনিফর্মে। সৈনিকরা যুদ্ধ করার জন্য তখনো পর্যন্ত পজিসন নেয় নি। ২৩শে এপ্রিল সোমবার প্রথম ওরা যুদ্ধের জন্য নিজের নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায়। তবে এই মুহূর্তগুলোতে সবচেয়ে ব্যস্ত ব্যক্তি কিন্তু হানস বাওয়ার। হিটলারের ব্যক্তিগত পাইলট। ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসের পর হিটলার আর প্লেনে চড়ে নি। যখন হিটলারকে বাওয়ার প্লেনে রাসটেনবুর্গ থেকে বার্লিনে এনেছিল, এরপরে হিটলার ট্রেনে করে আরডেনেসে্ যায়। আর বাওয়ার যায় ছুটি কাটাতে ব্যাভেরিয়ায়। ছুটি কাটিয়ে বার্লিনে ফিরে আসে জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি। বার্লিন শহরের আশেপাশে বিমানের ব্যাপার-স্যাপারে ওর মুখের কথাই ছিল একরকম আদেশ। তবু হানস্ কাজের অর্দ্ধেক সময়টাই কাটাতো বাংকারে। মাঝে মাঝে শহরেও বেরতো। হয় ব্রানডেনবুর্গ গেটের কাছে জরুরী বিমান নামার ব্যবস্থার তদারকীতে, অথবা যে কয়েকটা প্লেন টেম্পেলহোফ্ এয়ার-পোর্টের মাটির তলায় হ্যাঙ্গারে তখনো অক্ষত অবস্থায় রয়েছে, তাই

দেখতে।

বাওয়ারের কো-পাইলট কর্ণেল বিৎজ তখন বাংকারের চারদিকে ছোটাছুটি করে তালিকা প্রস্তুত করতে ব্যস্ত। অর্থাৎ বাংকার ছেড়ে কারা কারা যাবে। এর নাম দেওয়া হয়েছিল অপারেশান সেরাগলিও। এই তালিকাতে তাদের নামই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যারা হিটলার আদেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাখ্টেসগাডেনে যাবে। হিটলার যাবে কিনা তা' তখনো সুনিশ্চিতভাবে স্থির হয় নি। তবে হিটলারের সহচরদের প্রায় অর্দ্ধেকই সেই তালিকাভুক্ত ছিল। কারো কারো মতে হিটলারও এই সময় নিজেকে তৈরী করছিল ব্রাখটেসগাডেনে গিয়ে শেষ বারের মতো চেষ্টা করতে। যার নাম দেওয়া হয়েছিল—অপারেশান আলপাইন রি—ডাউট্। আইজেনহাওয়ারের হেড কোয়ার্টারের চীফ অফ ষ্টাফ, জেনারেল ওয়ালটার বেডেলস্মিথও নিশ্চিত ছিল যে হিটলার বার্লিন ছেড়ে উড়ে গেছে ইতিমধ্যে।

পরে অবশ্য বাওয়ার বলেছে যে বাংকার ছেড়ে যাওয়ার পুরো পরিকল্পনাটাই এসেছিল বোরম্যান মার্টিনের মাথা থেকে। হিটলারের এই ব্যাপারে বিশেষ খুব একটা সায় ছিল না। বাংকারে বোরম্যানের উপস্থিতি ছিল একান্তই সরব। মোটা দাগের। গাট্টাগোট্টা এবং মন্তপ এই মানুষটা এক কথায় বলতে গেলে হিটলারের ডানহাত ছিল। নাৎসী শেষ ক্ষমতাটুকুকে আপ্রাণ চেষ্টা করতো কী করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। তবে এই সময় হিটলারের কাছাকাছি আরো একজন এসে দাঁড়িয়েছিল। মেজর অটো গুয়েনখে। সাতাশ বছরের সুদেহী সৈনিক। ব্যক্তিগত জীবনে ফ্যুয়েরারের সিনিয়ার এস এস এ্যাডজুটান্ট। সেদিনগুলোয় আরো কয়েক ডজন মহিলার সরব উপস্থিতি ছিল বাংকারে। তার মধ্যে কয়েকজন ফ্যুয়েরার বাংকারে থাকলেও বেশীর ভাগ সময় কাটাতো রাইখ চ্যান্সেলারী এবং ব্যারাকে। তন্মধ্যে ফ্রাউলাইন অর্থাৎ কুমারী কনষ্টানজে ম্যানজিয়েলা, প্রায় চল্লিশ বছর বয়স্কা নিরামিষ রান্নার রাঁধুনি যে সব সময়েই ব্যস্ত। হাতে একটু অবসর পেলে আপার বাংকারের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করতো।

ফ্রাউলাইন এলজে ক্রুগার, বোরম্যানের সেক্রেটারী। এখানে বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে বোরম্যান ছিল মূলত কাগুজে পুরুষ। ছ'ছটা সেক্রেটারীকে সব সময় লেখাপড়া বা টাইপের কাজ দিয়ে ব্যস্ত রাখতো।

আরো তিনচারজন মহিলা কাজ করতো আর্মি সিগন্যাল করপে'র। ওদের প্রধান কাজ ছিল বাংকার আর রাইখ চ্যান্সেলারীর মধ্যে সংবাদ নিয়ে যাতায়াত করা। হিটলারের নিজস্ব চারজন সেক্রেটারী তখনো বাংকারে উপস্থিত। সবচেয়ে বয়স্কা হলো ফ্রাউলাইন জোহানা ওলফ। বয়সে প্রায় পঁয়তাল্লিশ। ১৯২৪ সাল থেকেই হিটলারের সঙ্গে আছে। দ্বিতীয়জন অবিবাহিতা। ফ্রাউলাইন ক্রিষ্টা শ্রোয়েডর। বছর তিরিশেক বয়েস। অপর দু'জন ভরা যুবতী এবং রূপসী। উভয়েই বিবাহিতা। ফ্রাউ গারডা ক্রিশ্চিয়ান। একদা এরিখ খেমকার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য প্রতিশ্রুত থাকলেও শেষে বিয়ে করে জার্মান এয়ারফোর্সের মেজর জেনারেল একহার্ড ক্রিশ্চিয়ানকে। ফ্রাউ গেট্রুড য়ুঙে সম্প্রতি বিধবা হয়েছে। হিটলারের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী এস বি কে'র এক করপোরেলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। ১৯৪৪ সালে রাশিয়ান ফ্রন্টে সে মারা যায়। অ্যামবাসেডর ওয়ালটার হেভেল বৈদেশিক দপ্তরে কাজ করতো। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব ছিল ওর ওপরে ন্যস্ত। ১৯২৩ সালের মিউনিখ বিয়ার হলের দিনগুলোয় হিটলারের সঙ্গে ওর পরিচয়। ১৯২৪ সালে ল্যাণ্ডেসবাগ জেলে হিটলারের সঙ্গেও একত্রে কিছুদিন জেলে কাটিয়েছে। খেমকা চ্যান্সেলারী গ্যারেজের দায়িত্বে থাকলেও বেশীর ভাগ সময়ই কাটাতো বাংকারে। হাইনস্ লিঙ্গে সহ আরো জনা বারো বাংকারের বিভিন্ন কাজকর্মে নিযুক্ত ছিল। অর্নেষ্ট কালটেনব্রুনার হিমলারের সহচর আর চীফ অফ্ গেষ্টাপো হাইনরিখ মূলার নিয়মিত যাতায়াত করলেও বাংকারে থাকতো না। তবে আরেক জনের নাম উল্লেখ না করলে পুরো ব্যাপারটাই অসমাপ্ত থেকে যাবে। হ্যাঁ, এস এস লেফটেনান্ট জেনারেল হারম্যান ফেগেলিন। ইভা ব্রাউনের

ভগ্নীপতি। হিটলার এবং হিমলারের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী ছিল ফেগেলিন। রোজ দু'বার হিটলারকে খবরাখবর জানাতে আসতো বাংকারে। এছাড়া ওর কাজ বলতে কিছু ছিল না। ক্যুরফ্রাষ্টেন-ডামের পাশেই সুসজ্জিত একটা ব্যাচেলার ফ্ল্যাটে মদ এবং মেয়ে বন্ধু নিয়ে সে পার করতো দিনের বাকী সময়টা। এছাড়া স্পীয়ার এবং গোয়েবেলস্ বাংকারে না থাকলেও দিন রাতের বেশীর ভাগই ওদের বাংকারে কাটতো। আর সব সময় বাংকারে ছায়ার মতো থাকতো মার্টিন বোরম্যান। ফিল্ড মার্শাল উইলিয়াম কাইটেল আর কর্নেল জেনারেল আলফ্রেড ইডন রাইখ চ্যান্সেলারীতে থাকলেও সপ্তাহে নিয়মিত বারদুয়েক বাংকারে হাজির থাকতো হিটলারকে সবশেষ পরিস্থিতি জানাতে। তবে জেনারেল হানস্ ক্র্যাংস আর উইলহেলম্ বুর্গডফ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বাংকারে উপস্থিত ছিল। ওদের সঙ্গে ছিল মেজর জেনারেল মংকে; দু'জন ডাক্তার প্রফেসর ভারনার হাসে এবং কর্ণেল আর্নেষ্ট গুন্থার শেনেক আর হিটলার যুব-বাহিনীর নেতা আর্তুর আক্সম্যান।

১৯৩৮ সালে রাইখ চ্যান্সেলারী ভবনের নক্শাটা স্পীয়ার ইউ-টলিটারিয়ান ষ্টাইলে তৈরী করেছিল। ব্যারাকের মতো সুবৃহৎ দুটো বাড়ী হারম্যান ষ্ট্রীটের ওপরে পরস্পর সমকোণ করে দাঁড়ানো। ফলে টিয়ারগার্টেন থেকে সহজেই এই নতুন রাইখ চ্যান্সেলারীটা নজরে পড়তো। ১৯৩৩ সালে যে ছোট্ট গোষ্ঠীটা নিয়ে হিটলারের যাত্রা সুরু হয়েছিল, সেই গোষ্ঠী ক্রমে ক্রমে বেড়ে অনেক বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মিলিটারী ব্যারাকের ষ্টাইলে তৈরী বাড়ী দুটোয় পুরো একটা রেজিমেন্ট থাকার মতো জায়গা ছিল। সরকারীভাবে এই রেজিমেন্টের নামকরণ করা হয়েছিল। লাইভ্ ষ্টানডারডে' অর্থাৎ লাইফ্ গার্ড— ছোটখাটো একটা প্লাটুনই বলা যেতে পারে। এই প্লাটুনে অর্থাৎ হিটলারের দেহরক্ষী দলে খুব বাছাই করে করে লোক নেওয়া হ'তো। দীর্ঘদেহী এবং উৎসর্গীকৃত প্রাণ যুবকদেরই শুধুমাত্র জায়গা হ'তো এই লাইফ গার্ড দলে। ১৯৩৪ সালে সেপ্প দিয়েট্রিচ এর প্রথম

স্রষ্টা। খুব অল্প দিনের মধ্যেই এটা একটা রেজিমেন্টের রূপ নেয়। নাম দেওয়া হয় বাফেন এস এস। যুদ্ধ সুরু হলে পরে ১৯৪০ সালে এই বাহিনীর সঙ্গে ট্যাংকও যোগ দেয়। হেড কোয়ার্টার হয় বার্লিনের বৃহৎ লিখটার ফেলডে ক্যাডেট্ ব্যারাক। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই রেজিমেন্ট হিটলারের বার্লিনে অবস্থানের সময় কিন্তু রাইখ চ্যান্সেলারী ব্যারাক ব্যবহার করতো।

মেজর জেনারেল উইলহেলম মংকে ছিল এই বাহিনীর শেষ কমাণ্ডিং জেনারেল। জার্মান এই এলিট্ ডিভিসন বলতে গেলে ব্রিটিশ গার্ডদের মতোই ছিল। একমাত্র এদের সঙ্গেই হিটলার সোজাসুজি যোগাযোগ রাখতো। ওদের মাধ্যমেই অনেক সময় হিটলারের আদেশ আসতো, বা প্রয়োজনে ওরা ফ্যুয়েরারের ভালেট্, ওয়েটার বা ক্যুরিয়ারের কাজ করতো। বিশেষ করে কেউ আহত হলে হিটলার ব্যক্তিগতভাবে তার খোঁজ খবর করতো। ফলে সেই সৈনিকও হিটলারের অনেক কাছে এসে দাঁড়াতো।

এফ বি কে'র ওপরে কিন্তু হিটলারের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার দায়িত্ব ছিল না। ওর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছিল রাইখ সিকিউরিটি সার্ভিস বা সংক্ষেপে আর এস ডি'র ওপরে। এস এস মেজর জেনারেল জোহান রাত্তেনহুবারের অধীনে। এই নিরাপত্তা বাহিনীতে পেশাগত পুলিশ অফিসার এবং সাদা পোষাকের গোয়েন্দারা থাকতো। তবে পুলিশ আর গোয়েন্দাদের মধ্যে ছিল টানা পোড়ানির সম্পর্ক। গোয়েন্দারা ছিল অভিজ্ঞ, তাই পুলিশদের ওরা মনে করতো নিছকই প্যারেড করা সৈনিক যারা নাকি মেয়েদের পেছনে ছুটে বেড়াতে অভ্যস্ত। একথা সত্য যে এফ বি কে'র লোকেরাও মেয়েদের পেছনে ছুটতো এবং এ বিষয়ে হিটলারের কাছ থেকেও ওরা নিয়মিত উৎসাহ পেতো। হিটলার রাইখ চ্যান্সেলারীর সব খবর না হলেও বেশীর ভাগ খবর রাখতো। রাগ তো দূরের কথা, অনেক সময়েই এসব ব্যাপারে জড়িত পুরুষদের উৎসাহও দিতো।

হিটলার ব্যক্তিগতভাবে বেশ কয়েক বছর ধরে ওর পুরনো দিনের

বন্ধু ওয়ালটার হেবেলের বিয়ে দিতে উঠে পড়ে লেগেছিল। কারণ হেবেল ছিল মুখচোরা লাজুক গোছের ব্যাচেলার। ইভা ব্রাউনের বোন গ্রীট্ল ব্রাউনের জন্য হিটলারের বাছা কয়েকজন পুরুষের মধ্যে একজন ছিল হেবেল। বিশেষ করে গ্রীট্ল যখন গর্ভবতী হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত হিটলারের অনুরোধে এস এস লেফটেনাণ্ট জেনারেল হারম্যান ফেগেলিন ওকে বিয়ে করে। এর পেছনে অবশ্য আরো একটা কারণ ছিল। তা হলো এই দম্পতির সঙ্গে যেন ইভা ব্রাউন সামাজিক বিভিন্ন পার্টিতে যেতে পারে। ১৯৪৪ সালের জুন মাসে ওদের বিয়ে হয়। ইভা ভগ্নিপতি ফেগেলিনের সঙ্গে বিভিন্ন পার্টিতে যাতায়াত সুরু করে। তখন অবশ্য কূটনৈতিক এবং সামাজিক পার্টির সংখ্যাও প্রায় মিলিয়ে এসেছে।

রাইখ সূর্যের অস্তাচলের বছরগুলোয় হিটলার দরবারের সব সদস্যকে বলে দেওয়া হয়েছিল যেন তারা হিটলারের দৈনিক রুটিনের সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে চলে। হিটলার ঘুম থেকে উঠতো প্রায় দশটা এগারোটার সময়। সুতরাং দুপুরের আগে ওর পক্ষে অফিসে আসা সম্ভব ছিল না। তাও অল্প কিছুক্ষণের জন্য। সেক্রেটারীদের সঙ্গে গল্পগুজব, অনুগামীদের চিঠিপত্র পড়া আর বড়জোর প্রেস কনফারেন্সে কি বলবে, সেই সম্পর্কে দু'একটা ডিক্টেসান। দু'টো নাগাদ চল্লিশ-পঞ্চাশজন জড়ো হতো ও মেরী চ্যান্সেলার্স রেষ্টুরেন্টে। হিটলার প্রথমে তাদের অভ্যর্থনা জানাতো রিসেপসান রুমে। যদি মনমেজাজ শরীফ থাকতো, তবে দু'চারটে হাসি ঠাট্টা বা মস্করা চলতো সেই সময়। ওদের মধ্যে বেশীর ভাগই থাকতো পার্টি সদস্য; কয়েকজন গাউলাউটার আর ডজনখানেক রাইখ চ্যান্সেলারীর নিয়মিত বাসিন্দা। বাওয়ার, সিপ্, দিয়েট্রিচ, গোয়েবেলস্ প্রভৃতি। প্রায়ই উপস্থিত থাকতো সিনিয়ার এ্যাডজুটেণ্ট শ্পীয়ার। গোটা চারেক নাগাদ এই খাওয়া-দাওয়ার পর্ব চুকতো। তারপর কখনো কখনো হিটলার আবার কিছু সময়ের জন্য অফিসে ফিরে যেতো। অবশ্য তা নির্ভর করতো যদি কেউ ওর সঙ্গে দেখা করতে আসতো।

নইলে স্পীয়ারের সঙ্গে করে আনা ব্লু-প্রিন্টের ওপর আলোচনা করতো।

পাঁচটার পর বসতো চা উৎসব। কখনো সেক্রেটারীরা, কখনো বা দু'চারজন অতিথি সেই উৎসবে উপস্থিত থাকতো। স্বীকার করতে বাধা নেই যে হিটলারের কাজকর্মের পদ্ধতি ছিল বিশৃঙ্খল। সত্যি-কারের গুরুত্বপূর্ণ সময় ছাড়া হিটলারের বোহেমিয়ান স্বভাব রুটিন বাঁধা কাজকর্ম যতোটা পারা যায় এড়িয়ে চলতো। শরীরগতভাবে অথবা ছোটবেলাব থেকে গড়ে ওঠা স্বভাবের দরুণ হিটলারকে আবেন্দ মেনস্ বা সান্ধ্য মানুষ বলা যেতে পারে। যার প্রাণশক্তি ফিরে আসতো সুর্য অস্তাচলে গেলে। জার্মানদের সান্ধ্য-ভোজ ব্যাপারটা মোটেই উপভোগের নয়। ঠাণ্ডা খাওয়া-দাওয়া। বিলাসিতাশূন্য। সাপারের সময়ে অতিথিরা বেশীর ভাগই ছিল বার্লিনের প্রমোদ জগতের বাসিন্দা; রাজনৈতিক বা সরকারী কাজে নিযুক্ত লোকদের সাপারে ডাকা হ'তো না বললেই চলে। তবে বাংকারে নিয়ম করে প্রত্যহ সাপারের সময় দু'দুটো সিনেমা দেখানো হ'তো।

মাঝরাতের কাছাকাছি সাপারের অতিথিরা বিদায় নিলে হিটলার ফায়ার প্লেসের কাছাকাছি বসতো। তখন ওকে ঘিরে থাকতো আগেকার শয়তানগুলো,—ডক্টর লে, ডক্টর মোরেল, হেবেল, বাওয়ার আর মাঝে-মধ্যে গোয়েবেলস্। কথাবার্তা রোজই একধরনের এবং একঘেয়ে; পুরনো দিনগুলোকে ঘিরে। মধ্যে মধ্যে বার্লিনের নতুন গুজব বা গোয়েরিংয়ের বিরুদ্ধে গোয়েবেলসের বলা রাজনৈতিক দু'চারটে চুটকি ছাড়া। শীতের তীব্রতা না থাকলে শহর বার্লিনে খুব সকালেই আকাশের বুকে দিনের আলো জেগে ওঠে; আমজেল পাখীরা একসঙ্গে চিৎকার শুরু করে; ক্লান্ত বিধ্বস্ত সঙ্গীদের শুভরাত্রি জানিয়ে হিটলারও শুতে যেতো। ঘড়িতে তখন সকাল পাঁচটা।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই এই ধরনের আলসে বোকার মতো পরিচালন ব্যবস্থা পৃথিবীতে আর কোন দেশে ছিল কিনা সন্দেহ। হারম্যান গোয়েরিং, হাইন্‌রিখ হিমলার সেই সব উপগ্রহের ছিল জুদে

শাসনকর্তা। অবশ্য জোখাইম ভন রিবেনট্রপ উল্লেখযোগ্যভাবে এইসব আসরে অনুপস্থিত থাকতো আর গোয়েবেলস্ চলতো ওর নিজের পথে। ফ্যুয়েরার হিসেবে হিটলারের কোন প্রতিযোগী ছিল না। কারণ হিটলার দ্বিতীয় স্থানের জন্য কায়দা করে সব সময় ওদের মধ্যে একটা ঝগড়া বাধিয়ে রাখতো। বার্লিন বাংকারের শেষের দিনগুলোয় এই প্রতিযোগিতা চরমে ওঠে। মার্টিন বোরম্যান এবং যোসেপ গোয়েবেলস এগিয়ে যায়। পিছিয়ে পড়ে গোয়েরিং আর হিমলার।

তবে একথা নিঃসন্দেহে সত্য যে হিটলারের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে একসিকিউটিভ ক্ষমতা বর্তমান ছিল। শাসন ব্যবস্থার সমস্ত প্রধান সমস্যাগুলোর দায়িত্ব নিজেই বহন করতো। এবং এই সমস্যা সমাধানে আদেশের আগে ব্রাখটেসগাডেনে গিয়ে চিন্তা ভাবনার পর তবে মতামত দিতো। অবশ্য অর্গানাইজিং ক্ষমতা ওর মধ্যে ছিল না। ১৯৩৮ সালে বোরম্যান রাইখ চ্যান্সেলারী গ্রুপে যোগদানের পর অর্গানাইজ ব্যবস্থাটা একটা রূপ নেয়। বোরম্যান ছিল বুরোক্রাট্। প্রশাসন ব্যবস্থা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে পেপার ওয়ার্কের প্রয়োজন, বোরম্যানই প্রথম তা' প্রবর্তন করে রাইখে। বোরম্যান প্রথম বেশ কয়েক বছর রুডলভ্ হেস্-এর প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করেছে। তখন হেস্ ছিল হিটলারের সেক্রেটারী। হেস যখন বুঝতে পারে ওর দ্বারা কাজ আর হবার নয়, নিজেই বোরম্যানকে পাঠিয়ে দেয় হিটলারের কাছে। যাতে হেসের স্বার্থটাও শেষপর্যন্ত কিছুটা বজায় থাকে।

বোরম্যানের আগে যে-কেউ ফ্যুয়েরারের কাছে সোজাসুজি যেতে পারতো। আর ফ্যুয়েরারের মুড ভালো থাকলে বিদেশ ভ্রমণ, সাময়িক ছুটি, নিদেন ছেলেমেয়েদের জন্য অটোগ্রাফ সহজেই ছুটে যেতো। ওদের কাছে হিটলার সহজ মানুষই ছিল।

মার্টিন বোরম্যান দায়িত্ব নিয়েই সব ব্যবস্থা পাল্টে দেয়। রাইখ চ্যান্সেলারীর সবাই বোরম্যানকে যেমন ভয় করতো, ঘৃণাও কম করতো না। এমন কি সেই দলে ওর নিজের ভাই আলফ্রেড পর্যন্ত

ছিল। আলফ্রেড তখন হিটলারের প্রাইভেট এ্যাডজুটেণ্ট হিসেবে কাজ করতো। এখানে বলা হয়তো বা অপ্রাসঙ্গিক হবে যে ২২শে এপ্রিল আলফ্রেড বাংকার ছেড়ে যায়। পরবর্তী জীবনে মিউনিকে ব্যবসায়ী হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। যাইহোক, হিটলারের অফিস ঘরের পাশের ঘরে বসে বোরম্যান হিটলারের কাছে অন্যের যাতায়াত সীমাবদ্ধ করতে সুরু করে। শুধু তিন চারজন মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ মিলিটারী অফিসার ছাড়া হিটলারের কাছে সোজাসুজি কেউ যেতে পারতো না। রিপোর্ট করতে হতো বোরম্যানকে। বোরম্যান সেই সব রিপোর্ট উপযুক্ত মনে করলে তবে তা' যেতো হিটলারের টেবিলে। হিটলারের শিল্পপতি বন্ধুদের কাছ থেকে যে বিপুল পরিমাণে টাকা পয়সা আসতো, তাও থাকতো বোরম্যানের কাছে। গাউলাউটারদের নিজের আয়ত্তে রাখার জন্য বোরম্যান সেইসব টাকা খরচ করতো। বাংকারে নতুন বাড়ী বা ঘর তৈরী করার ব্যাপারেও এই টাকা পয়সা ব্যবহার করা হ'তো। উপরন্তু নিজের পদমর্যাদা ব্যবহার করেও বোরম্যান কম টাকা জোগাড় করতো না। ১৯৩৯ সাল থেকেই হিটলার যখন সামরিক শক্তির ব্যাপারে নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে, বোরম্যান তখন পার্টির ভেতরে নিজের জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে চলেছে। এমন কি ইভা ব্রাউন একবার হিটলারের কাছে নালিশও করেছিল যে বোরম্যান ওর সামনে মদ, সিগারেট খায় না। খাওয়ার টেবিলে আমিষ খাওয়ার নেয়,—কিন্তু আড়ালে বোরম্যানের খাটের পেছনে ঝোলে পুরো একটা সালামি। মেয়েরা ওর অত্যাচারে অস্থির। বোরম্যান সেক্স-ম্যানিয়াক। কিন্তু হিটলার মনে হয় ইভার সেই অভিযোগের খুব একটা গুরুত্ব দেয় নি। কারণ বোরম্যানের দোর্দণ্ড প্রতাপ আগের মতোই চলতে থাকে। এমন কি হিটলারের ব্যক্তিগত টাকা পয়সাও থাকতো ওর কাছে। যার জন্য প্রয়োজনে ইভা ব্রাউনকেও ওর কাছেই হাত পাততে হ'তো।

১৫ই এপ্রিল একরকম নিঃশব্দে ইভা ব্রাউন বাংকারে থাকতে আসে। ইভার থাকার জায়গা হয় লোয়ার বাংকারে। ইভা অবশ্য

মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকেই বার্লিনে। তবে রাইখ চ্যান্সেলারীর একটা আলাদা অ্যাপার্টমেন্টে থাকতো। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয়, চারদিকের বাড়ীগুলো ধ্বংস হয়ে গেলেও ওর অ্যাপার্টমেন্ট অক্ষত ছিল। ইভা ব্রাউনের বাংকারে উপস্থিতিতে প্রায় সবাই বোঝে যে হিটলার বাংকার ছেড়ে ওভার সালজ্‌বুর্গের ব্রাখটেসগাডেনে যাবে না।

অ্যালবার্ট স্পীয়ারের ফ্রন্ট আর বাংকারে ছোটাছুটির তখন বিরাম নেই। যুদ্ধক্ষেত্র যতো ছোট হয়ে আসছে, ব্যাপারটাও ততো সহজ হয়ে উঠছে স্পীয়ারের কাছে। অপরাহ্নে হামবুর্গ ফ্রন্ট পরিদর্শন সেরে মাঝরাতেই বাংকারে এসে হাজির হতো স্পীয়ার।

জেনারেল গুডরিয়ানের জায়গায় তখন এসেছে জেনারেল হানস্ ক্র্যবস্। হানস্ মানুষ হিসেবে খারাপ ছিল না। রাতের পর রাত হিটলার স্পীয়ারকে জার্মান আর্মি ডিভিসন সম্পর্কে যেসব নির্দেশ দিতো, তখন সেইসব জার্মান আর্মি ডিভিসনের বেশীর ভাগের অস্তিত্বই ছিল না। একে একে তখন ফ্রাংকফুর্ট, কাসেল, হ্যানওভার এবং ক্রনস্‌ভিক শহরের পতন ঘটেছে। একদিন সত্যিকারের যে জার্মান সেনাবাহিনী ফ্রান্স, ভলগা এবং ব্ল্যাক-সী পর্যন্ত এগিয়েছিল, তাদের অস্তিত্ব না থাকলেও হিটলার তখন সেইসব বাহিনী দিয়েই পটাশডাম ঘেরার স্বপ্ন-দেখছে।

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি হিটলার ফিল্‌ড মার্শাল কাইজারলিঙকে বাংকারে ডেকে পাঠায়। ফিল্‌ড মার্শালের হেড কোয়ার্টার তখন আড্‌লারহোসর্ট থেকে থুরিঙ্গিয়ান ফরেষ্টের কাছাকাছি এসেছে। আমেরিকান সৈনিকরা তখন মাত্র আইজেনয়াক দখল করেছে। হিটলার কাইজারলিঙ্‌কে আদেশ দেয়, কয়েক শো ট্যাংক নিয়ে ওদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে। কাইজারলিঙ্‌ রাজী হলেও তখন সেই ফ্রন্টে খুব বেশী হলে তিরিশ চল্লিশটা ট্যাংক বর্তমান। তাও গ্যাসের অভাবে অচল। কাইজারলিঙ্‌ হয়তো সায় দিয়ে সত্যি কথাটা বলে নি হিটলারকে। কারণ তখন একটা দিন বাঁচিয়ে রাখার অর্থ শেষের

কাছাকাছি একদিন আগে পৌঁছনো। যুদ্ধের সমাপ্তি যে কোনদিন হ'তে পারে।

সেই সপ্তাহেই, সম্ভবত তারিখটা ১৮ই এপ্রিল, বাওয়ার ওর জানালা ছাড়া আসবাবপত্রবিহীন ফ্ল্যাটটা পরিষ্কার করছিল। হঠাৎ কাছাকাছি বিস্ফোরণের শব্দ পায়। টিয়ারগার্টেনের গাছগুলো বোমার আঘাতে ইতিমধ্যেই বিধ্বস্ত। প্রথমে ভাবে দেরী করে ফাটা কোন বোমার আওয়াজ এটা। তবে আকাশে প্লেনের কোন চিহ্ন নেই। হয়তো বা ব্রিটিশ মস্‌কিটো প্যারাস্যুটে কোন ল্যাণ্ড মাইন্‌ নামিয়েছে। বাওয়ারের মতো সুদক্ষ পাইলটের কাছেও শব্দটা অজানা। তবে একেবারে অপরিচিত নয়। আবার আর একটা বিস্ফোরণের শব্দ। এবারে বাওয়ার বুঝতে পারে যে শব্দটা সেভেনটিন পয়েণ্ট ফাইভ সেণ্টিমিটার গানের। দুপুরবেলা কিছুটা ভীতচকিত হয়েই বাওয়ার হিটলারকে ব্যাপারটা জানায়। হিটলার বুঝতে পারে রাশিয়ান সৈন্যরা নিশ্চয়ই ওডার নদীর কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। তার মানে, একেবারে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

হিটলারের স্মৃতি প্রথম মহাযুদ্ধের দিনগুলোয় ফিরে যায়। জার্মান বিগ্‌ বার্থা যখন প্রায় সত্তর মাইল দূর থেকে শহর প্যারিসের ওপরে গোলাবর্ষণ করেছিল। হিটলার আরো ভয় পায়, রাশিয়ানরা যখন সোজাসুজি রাইখ চ্যান্সেলারী লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ করছে, তার মধ্যে গ্যাস বোমাও থাকতে পারে। প্রথম মহাযুদ্ধে গ্যাসের ব্যবহার করা হলেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তখন পর্যন্ত তা' হয় নি। তবু জার্মান গোয়েন্দা বিভাগের ধারণা ছিল রাশিয়ানদের কাছে এমন বিষ গ্যাস আছে, যে গ্যাসের প্রভাবে মানুষ চব্বিশ ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে থাকে। হিটলার বরাবর ভয় পেতো যে ওকে অজ্ঞান করে জীবিত অবস্থায় প্রতিপক্ষ ধরে নিয়ে যাবে। যেভাবে চিড়িয়াখানার হিংস্র জানোয়ারদের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়।

২০শে এপ্রিল, শুক্রবার। হিটলারের জন্মদিন। ১৯৩৩ সাল থেকেই হিটলারের জন্মদিন জাতীয় ছুটির দিন হিসেবে পালিত হয়ে

আসছে জার্মানীতে। গত কয়েক বছরের মতো এবারেও হিটলারের জন্মদিন পালিত হয় নতুন রাইখ চ্যান্সেলারীতে। এটাই হলো রাইখের স্তম্ভ হারম্যান গোয়েরিং, হাইনরিখ হিমলার প্রভৃতির প্রকাশ্যে শেষ দর্শন। বেশীর ভাগ মন্ত্রীই তখন বাংকার ছেড়ে চলে গেছে। স্পীয়ার থাকতো বাড্ ভিনস্‌নেকে; বার্লিনের একশো মাইল উত্তর পশ্চিমে। সেখান থেকেই নিয়মিত গাড়ীতে আসে বাংকারে। সবাই মার্টিন বোরম্যানকে মধ্যমণি করে হিটলারকে বোঝায় বাখটেস্‌গাডেনে চলে যেতে। শেষমেষ হিটলার ওর অর্দ্ধেক ষ্টাফ বাখটেস্‌গাডেনে সরিয়ে দিতে রাজী হয়; স্থির হয় সোমবারে তারা বাংকার ছেড়ে যাবে। তবে সবাই বোঝে যে কোন অবস্থাতেই হিটলারকে বার্লিন ছেড়ে নড়ানো যাবে না। এই সময়েই স্পীয়ার খবর পায় যে ওর বন্ধু ডাক্তার কার্ল ব্রাণ্ড্ আর বেঁচে নেই। ডাক্তার ব্রাণ্ড্ ১৯৩৬ সাল থেকেই হিটলারের ব্যক্তিগত চিকিৎসক। ব্রাণ্ডের অভিযোগ ছিল যে ডাক্তার মোরেল হিটলারকে ভুল ওষুধ দিচ্ছে। বোরম্যান ডাক্তার মোরেলকে সমর্থন করতেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে পুরো পরিবারকে থুরিঙ্গিয়াতে পাঠিয়ে দেয়। আমেরিকানদের দখলে তখন সেই অঞ্চল। হিটলার খবর পেয়ে ব্রাণ্ডের কোর্ট মার্শালের আদেশ দেয়। নিজে সেই কোর্ট মার্শালে উপস্থিত থেকে ব্রাণ্ডকে গুলি করে মারার নির্দেশ কার্যকরী করে। যে রক্ততৃষ্ণা নিয়ে থার্ড রাইখের জন্ম—সেই রক্ততৃষ্ণা বুকে নিয়েই হয়তো বা থার্ড রাইখের সমাপ্তি ঘটতে চলেছে।

২২শে এপ্রিল; রোববার। স্পীয়ার বাড্ ভিনস্‌নেকেই দিনটা কাটায়। জীবনে এই প্রথম নিজের হাতে পিস্তল তুলে নেয়। লেকের পাড়ে একটা গাছ লক্ষ্য করে টার্গেট প্র্যাকটিশ করে। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে স্পীয়ার বর্তমানে ব্রিটিশ ও আমেরিকান সৈন্য-দলের অনেক কাছাকাছি। কারণ মিত্রশক্তি এলবে পেরিয়ে পশ্চিমতীরে এসে গেছে। সেইদিন সন্ধ্যার একটু আগে কর্নেল ভন বেলোর কাছ থেকে গোপন টেলিফোন পায় স্পীয়ার যে ফ্যুয়েরারের নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছে।

॥ পাঁচ

২২শে এপ্রিল, ১৯৪৫ সাল। রোববার। গোয়েবেলস্ স্ত্রী মাগদা ছটি সন্তানসহ বাংকারে আসে। হিটলারের সবচেয়ে বিশ্বস্ত সঙ্গী সব থেকে কাছে আসে। সঙ্গে নিজস্ব বলতে পৃথিবীতে যা আছে, সবকিছু নিয়ে।

বাংকারের বাসিন্দাদের কাছে গোয়েবেলসের হঠাৎ ওই বাংকারে এসে আশ্রয় নেওয়ার অর্থ' একটাই। ইভা ব্রাউন যখন সপ্তাহখানেক আগে এসে বাংকারে আশ্রয় নিয়েছিল, তখনো ওরা যে ধারণা নিয়েছিল—গোয়েবেলসের আগমনে তা' আরো দৃঢ় হয়। যুদ্ধ শেষ হয়ে এসেছে। এমন কি মানসিক ভারসাম্য হারানো অতি আশাবাদীও বোঝে যে ব্যাপারটা আর কয়েক দিনের।

গত সপ্তাহে রেড আর্মি ওডার নদী পেরিয়ে বার্লিন শহরতলীতে এসে হাজির হয়েছে। শহর তিনদিকে ঘেরা। দক্ষিণের একটা রাস্তা আর পশ্চিমের একটা রাস্তা মাত্র খোলা রয়েছে। এলবের ধারে কাছে ব্রিটিশ বা আমেরিকানদের চিহ্নমাত্র নেই। সুতরাং শেষ আশার সূর্যটাও তখন ডুবে গেছে দিগন্তের কুয়াশায়। একদিন আগে মাত্র হিটলার এস এস জেনারেল ষ্টাইনারকে উত্তর পশ্চিম বার্লিনে প্রতি-আক্রমণ করতে আদেশ দিয়েছে। ষ্টাইনারের সৈন্যদল তখন বিধ্বস্ত। মাত্র এগারো হাজার সৈন্য। পঞ্চাশটারও কম ট্যাংক॥ তার মধ্যে

যাবার অর্দ্ধেক ট্যাংক গ্যাসের অভাবে অচল। ষ্টাইনারের পক্ষে আক্রমণ করা দূরে থাক, ওর নিজের পালিয়ে যাবার পথও তখন প্রায় রুদ্ধ হয়ে এসেছে।

কিন্তু হিটলার স্বপ্ন দেখছে যে ট্যাংক সুসজ্জিত তিন ডিভিসন সৈন্য তখনো ওর যুদ্ধ করার জন্য তৈরী। বাংকারে বসে যখন খবর পায় ষ্টাইনার আক্রমণে ব্যর্থ, দলে দলে রেড আর্মি বার্লিন শহরের কেন্দ্রভূমি লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে, হিটলার রাগে ফেটে পড়ে। ওর ধারণায় চিরটাকালই জার্মান সেনাবাহিনী বিশ্বাসঘাতক। বুদাপেস্তের পতনের পর থেকেই হিটলার একই কথা বলে আসছে। ২২শে এপ্রিল দুপুরবেলা আর নিজেকে সামলে রাখতে পারে না হিটলার। চিৎকার করে ওঠে,—যুদ্ধে আমরা হেরে গেছি। প্রকাশ্যে হিটলারের ফেটে পড়া এই প্রথম নয়, কিন্তু এবারের মতো আর কখনো এতো হতাশায় ফেটে পড়ে নি। এমন কি গুডারিয়ানের ওপরে যখন রেগে গিয়েছিল, তখনো এতোটা উত্তেজিত হতে ওকে দেখা যায় নি। মুখ খড়িমাটির মত সাদা। নীলের কোন চিহ্ন নেই। দীর্ঘ কয়েকটা মিনিট নীরবতার পর চেয়ারে বসে পড়ে। কাঁপতে থাকে। চারজন সিনিয়র জেনারেল অর্থাৎ কাইটেল, জোডল, ক্র্যাবস, বুর্গডর্ফ এবং মার্টিন বোরম্যান ছাড়া আর সবাইকে কনফারেন্স রুম ছেড়ে চলে যেতে আদেশ দেয়।

কনফারেন্স রুমের মাঝখানে পাতলা প্লাইউড দিয়ে ঘরটা ভাগ করা। সবাই ওপাশে গেলেও পার্টিশনের দেওয়ালে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করে ওঘরে কী চলেছে। কয়েকজন তো ধরে নিয়েছে হিটলারের হার্ট অ্যাটাক বা ষ্ট্রোক হয়েছে। বাকী সবাই ভাবে হিটলার ক্লান্তিতে নিঃশেষ। তবে এ বিষয়ে সবাই একমত যে এটা ওর অভিনয় নয়। সিনিয়ার জেনারেল চারজন একরকম হতভম্ব অবস্থাতেই আধঘণ্টা পরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। অ্যাডজুটেন্টরা কোন রকমে ওদের মুখ থেকে কিছুটা শুনেই ছোটে টেলিফোনের দিকে।

হিটলার ওদের যা বলেছিল, তার সারাংশ হলো : যুদ্ধে জার্মানী

হেরে গেছে। সুতরাং সুপ্রিম কমাণ্ড ও ছেড়ে দেবে।

কাইটেলের এবং জোডলের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয় দক্ষিণে প্রতিরোধ করার। আর হিটলার স্বয়ং বার্লিনের যুদ্ধ পরিচালনা হাতে নেবে। আত্মসমর্পণ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তবে শরীরের যা অবস্থা তাতে ওর পক্ষে দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ পরিচালনা করাও তো সম্ভব নয়। সুতরাং আত্মহত্যা করবে। আর যারা যারা বাংকার ছেড়ে যেতে চায়, যেতে পারে। তবে সব মেয়েদের প্লেনে ব্রাখটেসগাডেনে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

এর পরেই হিটলার সবাইকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বলে। যাতে ও একলা থাকতে পারে।

মিনিট কুড়ি পরে হিটলার মেজর অটো গ্রাইস্‌লেকে ওর সিনিয়ার এ্যাডজুটেণ্ট এস এস মেজর জেনারেল জুলিয়াস শাউবকে ডেকে দিতে বলে। এই জুনিয়ারের কাছে হিটলারের ষ্টাডি রুমে রাখা আলমারীর ম্যাচিং চাবি ছিল। জুলিয়াস এবং হিটলার দু'জনে মিলে আলমারী থেকে হিটলারের ব্যক্তিগত কাগজপত্র বার করে। কয়েকটা শাউবকে রেখে দিতে বলে বাকীগুলো পুড়িয়ে ফেলার আদেশ দেয়। দু'জন পরিচারককে সঙ্গে নিয়ে শাউব ইমারজেন্সী গেট দিয়ে চ্যান্সেলারীর বাগানে এসে কাগজগুলো পুড়িয়ে দেয়। শাউব ফিরে এসে দেখে হিটলার ওর ব্যক্তিগত বিরাট বড় ওয়ালথার পিস্তলটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। পিস্তলটা আলমারীতেই ছিল। পরে এটাকে ওর শোওয়ার ঘরের ড্রেসিং টেবিলের ওপরে রাখা হয়। শাউব ফিরে যায়। ভাবে, এই মুহূর্তটাই বোধহয় হিটলারের শেষ মুহূর্ত। কিন্তু পরক্ষণেই ইভা ব্রাউন এসে হাজির হয়। মিনিট দশেক হিটলারের সঙ্গে কাটিয়ে ফিরে যায়। তখন বিকেল প্রায় পাঁচটা। হিটলার গোয়েবেলসের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে সুরু করে। গোয়েবেলস্‌ই ওকে বুঝিয়ে বলে তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা করার থেকে বিরত থাকতে। হিটলারও মেনে নেয়। পরিবর্তে বার্লিন রেডিওতে প্রপাগাণ্ডা মিনিষ্টার গোয়েবেলস্‌কে প্রচার করার অনুমতি দেয় যে, ফ্যুয়েরার বার্লিন এবং

রাজধানী রক্ষায় সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে প্রয়োজনে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত।

বার্লিনের বাসিন্দারা এই প্রথম জানতে পারে যে হিটলার বার্লিনে রয়েছে। ওরা হিটলারের গলার স্বর শেষ শুনেছিল ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৪৫ সালে। রেডিওতে। তবে হিটলার বলে নি কোথা থেকে ও বলছে। ওর অনুরোধে ২২শে এপ্রিল গোয়েবেলস্‌ও রেডিওতে বক্তৃতা দেয়। সন্দেহ নেই বাংকারের অন্যান্যদের থেকে এতে গোয়েবেলসের গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়। সবাই হিটলারকে ব্রাখটেস গাডেনে সরে যেতে অনুরোধ করলেও স্পীয়ার কিন্তু কিছু বলে নি। শেষপর্যন্ত গোয়েবেলস্‌ও আণ্ডার গ্রাউণ্ডে যাওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নেয়।

বাংকারে ইতিমধ্যে চায়ের সময় হয়ে গেছে। হিটলারের জীবনে এটা যে একটা অতি সংকটময় মুহূর্ত সেই বিষয়ে সন্দেহ নেই। যারা ওকে ঘিরে রয়েছে, তাদের ওপর বিশেষ করে জেনারেলদের ওপর বীতশ্রদ্ধ। সুতরাং যতোটা পারা যায় বাংকারের মেয়েদের সঙ্গেই সময় কাটাতে চায় হিটলার।

রোববারের এই চায়ের আসরে যে দুজন যুবতী সেক্রেটারী ডিউটিতে ছিল, তারাই ওর সঙ্গে চা-য়ে যোগ দেয়। গার্দা ক্রিশ্চিন এবং গাট্রুড ইয়ুঙে। তা'ছাড়া ইভা ব্রাউন। প্রথমে হিটলার তিনজনকেই ব্রাখটেসগাডেনে চলে যেতে আদেশ দেয়। কারণ হিসেবে জানায় যে যুদ্ধের পরিস্থিতি মোটেই সুবিধাজনক নয়। কিন্তু সুখী হয় যখন দেখে তিনজনের কেউই ওর আদেশ মানতে রাজী নয়। বাংকারেই থাকতে চায়। গার্দার মতে হিটলার কথাবার্তা বলছিল পাশার ঢঙে।

ওদের কথা শুনে হিটলার বলে,—আঃ, আমার জেনারেলরা যদি এই মেয়েদের মতো সাহসী হ'তো। এরপরেই হিটলার চেয়ার ছেড়ে উঠে ইভার ঠোঁটে চুম্বন করে। এর আগে প্রকাশ্যে চুম্বন করতে হিটলারকে কেউ দেখে নি। ইভার মুখ চোখ রাঙা হয়ে ওঠে, হিটলারের চোখ দুটো তখন অশ্রুভারাক্রান্ত। সৈনিক-পরিচারক

করপোরাল শাউবেল নিঃশব্দে পট্ থেকে কাপে চা ঢালে। হিটলার চক্লেট আর বিস্কুটের প্লেট এগিয়ে দেয়। আত্মহত্যার কথাবার্তা আর ওঠে না।

গোয়েবেলস্ ইতিমধ্যে রেডিওতে কি প্রচার করা হবে তা' নিয়ে ব্যস্ত। ব্রানডেনবুর্গ গেটের কাছে সারাদিনই ওর নিজের ফ্ল্যাটে ব্যস্ততার মধ্যে কাটে। বর্তমানে অফিস ওর আলাদা নেই। নিজের ফ্ল্যাটেই টেনে এনেছে অফিস। বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময় সমস্ত ষ্টাফদের ডেকে সঙ্গে সঙ্গে চাকরী থেকে বরখাস্ত করে বলে ওদের যুদ্ধে যেতে হবে। অবশ্য যারা পালিয়ে প্রাণে বাঁচতে চায়, তারা তা' করতে পারে। ওর সাহায্যকারীরা ইতিমধ্যেই ওর ব্যক্তিগত কাগজ-পত্র সব পুড়িয়ে ফেলেছে। একজন তো সারাটাদিন ব্যস্ত ছিল ওর ডায়েরীর মাইক্রোফিল্ম্ করার কাজে।

হু'টো মার্সিডিজ লিমুজেন গাড়ী দোরগোড়ায় অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে। তারমধ্যে একটা বুলেট-প্রুফ। ১৯৪১ সালে বার্লিনে ওর গাড়ীর ওপর আততায়ী গুলি ছুঁড়লে পরে হিটলার ওকে এই গাড়ীটা উপহার দিয়েছিল। একটা গাড়ীতে মালপত্র রেখে আর একটা গাড়ীতে স্ত্রী সন্তানসহ গোয়েবেলস্ ওঠে। ড্রাইভার রাখের পাশে বসে। অনেক পথচারীই এই দৃশ্যের প্রত্যক্ষদর্শী। ধীরে ধীরে গাড়ী হু'টো চ্যান্সেলারীর দিকে চলতে শুরু করে। এতো আস্তে যেন কোন শোকযাত্রায় চলেছে।

সন্দেহ নেই গোয়েবেলস্ মনে মনে বার্লিনকে শুভ বিদায় জানিয়েছিল। তবে ফ্যুয়েরার নিশ্চয়ই ওকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাবে। দীর্ঘ টেলিফোনের কথাবার্তাতেই তা' বুঝেছিল গোয়েবেলস্। তবে অবশ্য গোয়েবেলস্ সত্যিকারের রাশিয়ানদের আক্রমণের সময়টাকে আঁচ করতে পারে নি। ভেবেছিল হু'একদিনের মধ্যেই বার্লিন রাশিয়ার দখলে চলে যাবে। তাই ছেলেমেয়েদের জন্য কিছুই সঙ্গে নেয় নি। কয়েকটা খেলনা ছাড়া। মাগ্দার সঙ্গে ছিল পরণের পোষাক ছাড়া আর একটা পোষাক। আর গোয়েবেলস্ নিজে সঙ্গে

এনেছিল ঝকঝকে দু'টো সাদা সার্ট। কিন্তু রাশিয়ানরা গোয়েবেলস্ যতো তাড়াতাড়ি ভেবেছিল, ততো তাড়াতাড়ি শহর দখল করতে পারে নি। ওদের বার্লিন কব্জা করতে আরো আট দিন লেগে গিয়েছিল।

হিটলারের আত্মহত্যার চিন্তাটাকে কয়েকটা দিন দূরে ঠেলে দিয়ে গোয়েবেলস্ বাংকার নাটকটাকে কিছুটা দীর্ঘতর ছাড়া আর কিছু করতে পারে নি।

সেই রোববারে গোয়েবেলস্ পরিবার যখন বাংকারে পৌঁছায়, বেশীর ভাগ বাংকার সদস্য তখন বাংকার ছেড়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বাংকার ইভাকুয়েসানের পুরো ব্যাপারটার দায়িত্বে রয়েছে হানস্ বাওয়ার। অপেক্ষা করছে রাতের অন্ধকার নামার। তারপরেই সুরু হয়ে যাবে অপারেশন সেরেগ্লিও। ব্রাখটেসগাডেনে যাত্রা। ডক্টর মোরেলের ছেড়ে যাওয়া লোয়ার বাংকারের একটা ঘরে গোয়েবেলস্ ঠাঁই নেয়, মাগ্দার জন্য আপার বাংকারের একটা ঘর নির্দিষ্ট হয়। পাশেই তিনটে ছোট ছোট ঘর। ওর ছেলেমেয়েদের জন্য। করিডরে তখন রাইখ চ্যান্সেলারীর গোটা চল্লিশেক সদস্য তাদের মালপত্র নিয়ে বাংকার ছেড়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রা সুরু হয়ে যায়। চলে প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত। হিটলার ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে সবাইকে একে একে শুভবিদায় জানায়। কারণ সবাই জানে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের দেখা এ জীবনে আর হবে না। একে একে জোহানা ওলফ্, ক্রিস্টা শ্রোয়েডর, হিটলারের নেভাল এইড্ এডমিরাল কার্ল জেস্কো ভন পুট্কামার, এ্যাডজুটান্ট আল্ব্রাখট, মার্টিন বোরম্যানের ভাই অ্যালবার্ট ইত্যাদিরা বাংকার ছেড়ে চিরদিনের মতো চলে যায়। মাত্র দশটা প্লেন অক্ষত অবস্থায় যাত্রার জন্য তৈরী। তার কয়েকটা বাওয়ার আগে থেকে টেম্পেলহোফ্ থেকে সরিয়ে গেটাউ এয়ারপোর্টে নিয়ে রেখেছিল। প্লেনগুলোয় ফাইল, ব্যক্তিগত জিনিষ-পত্র এবং মূল্যবান সোনা হীরা ভর্তি করে। রাত ন'টার থেকে মাঝ-রাতের মধ্যে দশটার মধ্যে নটা প্লেনই নিরাপদে মিউনিকে পৌঁছায়। দশম প্লেনটার পাইলট ছিল অভিজ্ঞ মেজর ফ্রেডরিখ গুনডেল ফিংগার।

সেটাতেই ইঞ্জিনের গোলমাল দেখা দেয়। মাঝরাতের প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে যাত্রা সুরু করে। এই একঘণ্টা অতি সংকটময় সময়। কারণ আকাশের বুকে আলোর আভা জাগলেই ইউ এস এয়ারফোর্স ফাইটার ক্ষুধিত নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে। বাওয়ার ঘণ্টা কয়েক ঘুমিয়ে নিয়েও যখন দেখে প্লেনটা মিউনিকে এসে পৌঁছায় নি, তখন ২৩শে এপ্রিল বাংকারে হিটলারকে বাওয়ার টেলিফোনে প্লেনটা মিউনিকে এসে না পৌঁছনোর খবর দেয়। হিটলার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। কারণ এই প্লেনের মধ্যে দশটা বৃহৎ আলমারীতে ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত হিটলারের সমস্ত বক্তৃতা এবং টেবিলে আলোচনা ষ্টেনোগ্রাফি করা। সব মিলিয়ে প্রায় তিরিশ লক্ষ শব্দ। ওজন আধটন।

বাংকারের সবাই খবরটাতে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। পরে খবর পাওয়া যায় প্লেনটা ব্যাভেরিয়াতে বিধ্বংস হয়েছে। প্লেনের সবার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়। আগুনে পুড়ে। সামনের একটা কবরখানাতে স্থানীয় লোকেরাই মৃতদেহগুলোকে কবরস্থ করে। হিটলারের যাবতীয় কাগজপত্রও পুড়ে ছাই হয়ে যায়। প্লেনটার ভূপতিত হওয়ার শব্দ চার পাশের গ্রামের অনেকে শুনতে পেলেও প্লেনটাকে পড়তে কেউ দেখে নি। তাই ব্যাপারটা আজ পর্যন্ত রহস্যময় হয়ে রয়েছে।

এতোগুলো পরিচিত মুখ এক রাত্রের মধ্যে বাংকার ছেড়ে যাওয়াতে বাংকারের দৈনন্দিন জীবনেও পরিবর্তন আসে। বিশেষ করে গোয়েবেলস্ এবং তার পরিবার আর ইভা ব্রাউনের উপস্থিতিতে সবার চোখের সামনে যেন দেওয়াল লিখনটা ভেসে ওঠে। ব্রাখটেসগাডেনে যাওয়ার স্বপ্ন যাদের ছিল, তাদের চোখ থেকে সেই স্বপ্ন মুছে যায়। নিয়ম মাফিক বারো ঘণ্টা করে ডিউটি করার মতো লোকেরও অভাব দেখা দেয়। এক নাগাড়ে একজনকেই নির্দিষ্ট কাজ করতে হয় বলে চারদিকে বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হয়। সবাইকে স্লিপিং ব্যাগ দেওয়া হয়। যাতে যত্র তত্র শুয়ে ডিউটির মধ্যেই কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে পারে। অনেক সৈনিক উচ্চপদস্থ অফিসারদের দেখলেও আর সেলাম দেয় না।

এলবের কাছাকাছি এসে অ্যালবার্ট স্পীয়ার আবার মনস্থির করে বার্লিনে যাওয়ার। বাড্ ভিলস্‌নেক থেকে বার্লিন স্বাভাবিক অবস্থায় মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের পথ। কিন্তু বর্তমানে উত্তর এবং দক্ষিণের রাস্তা ছুটোয় রাজধানী ছেড়ে আসা গাড়ীর ভিড়ে এগোনই মুস্কিল। কর্নেল ম্যানফ্রেড ভন পোজারও সঙ্গে। গাড়ীর ভিড় এড়িয়ে মাত্র একশো মাইল পথ আসতে উভয়ের দশ ঘণ্টা সময় লেগে যায়। তবু শেষ পর্যন্ত গাড়ীতে পৌঁছানোর আশা ছেড়ে দিয়ে রেখ্‌লিনের এয়ারবেসের দিকে এগিয়ে চলে। বার্লিনে টেলিফোন করে বন্ধু ডক্টর কার্ল ব্রানডের খবর জানার জন্য। হিমলারের নির্দেশে ইতিমধ্যে ডক্টর ব্রানডকে বার্লিনের শহরতলী থেকে উত্তর জার্মানীতে সরিয়ে দিয়েছে। স্পীয়ার কিছুটা আশ্বস্ত হয়। তারমানে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গাতেই আছে। মার্টিন বোরম্যান নয়, হিমলারই ডক্টর ব্রানডের মাথা নেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিল। তবে স্পীয়ারের মনে হয় ব্রানডের প্রতি যে আক্রোশ, সেই আক্রোশ ওর প্রতিও ওদের রয়েছে। স্পীয়ার কিছুক্ষণ পরে ওর আরেক বন্ধু শিল্পপতি ডক্টর লুস্‌খেনকে টেলিফোন করে। বেশ কিছুদিন থেকেই স্পীয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে বৃদ্ধ এই শিল্পপতি যেন নিজের নিরাপত্তার কথা মনে রেখে সময় থাকতে বার্লিন ছেড়ে যায়। ডক্টর লুস্‌খেন বেশ কয়েক শো ইহুদীকে প্রয়োজনীয় কর্মী বলে ঘোষণা করে এ ই জি কারখানার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে। গোয়েবেলসের কানে বাতাসে সেই খবর পৌঁছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোয়েবেলস্ দাবী তুলেছে, ওদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে। স্পীয়ার লুস্‌খেনকে সেই সন্ধ্যায় রাইখ চ্যান্সেলারীতে ওর সঙ্গে দেখা করতে বলে।

স্পীয়ারের ফিরে আসার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিটলারের কাছ থেকে শুভবিদায় নেওয়া। তিনদিন আগে কনফারেন্স ছেড়ে যাওয়ার সময় তা' আর বলা হয়ে ওঠে নি। মন্ত্রীরা কেউই হিটলারের সঙ্গে সাধারণত হ্যাণ্ডশেক করে না। কিন্তু বর্তমানের জুয়া খেলায় কে থাকবে আর কে থাকবে না, এই অনিশ্চয়তার সূতোয় সবার ভাগ্যই ঝুলছে। তাই

মনের মধ্যে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার একটা তাগিদ অনুভব করে স্পীয়ার।

জেনারেল ক্রিশ্চান ছিল হিটলারের সেক্রেটারী গার্দা ক্রিশ্চানের স্বামী। গার্দা বাংকার ছেড়ে যেতে রাজী না হলেও জেনারেল ক্রিশ্চান বাংকার ছেড়ে যায়।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে জেনারেল ক্রিশ্চান, স্পীয়ার এবং ভন পোজার রেখ্লিন থেকে গেটাউএ উড়ে আসে। রাশিয়ান ট্যাংক পটাসডাম শহরতলীতে তখন হাজির হয়ে গেছে। কিন্তু গেটাউ থেকে ডাউন টাউন বার্লিনের হাই-ওয়ে খোলা। স্পীয়ার এবং ওর সঙ্গীরা সহজেই বাংকারে চলে যেতে পারতো। পরিবর্তে কিছুটা অ্যাডভেন-চারের নেশাতে দু'টো ফিজলার প্লেনে চড়ে বসে। মিনিট দশেক পরে প্লেন দু'টো যাত্রীসহ নামে ব্রানডেনবুর্গ গেটে। ওখান থেকে যায় রাইখ চ্যান্সেলারীতে। রাস্তাঘাট যথেষ্ট বিপদসংকুল। রাশিয়ানরা ইতিমধ্যে এন্টি-এয়ার ক্রাফট্ গান বসিয়েছে।

রাইখ চ্যান্সেলারীতে ঢুকে দেখে এখানে ওখানে লণ্ড্—ভণ্ড রেড আর্মির কামানের গোলার দাগ। তবে তেমন বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নি। এ্যাডজুটেন্টের অফিসে যেতে গিয়ে দেখে প্রচুর পোড়া জিনিষপত্র। অফিসের মধ্যে মদের পার্টি চলেছে। সর্বত্রই বিশৃঙ্খলার ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। এই সুন্দর ঘরগুলোতে একদা বিসমার্ক থাকতো; চ্যান্সেলার হওয়ার প্রথমদিকে হিটলারের সঙ্গেও এই ঘরে অনেক সময় কাটিয়েছে স্পীয়ার। মেজেতে খালি বিয়ারের এবং মদের বোতল, স্যাণ্ডউইচ ইত্যাদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে। ঘরের মধ্যে যারা আসছে-যাচ্ছে, তাদের মুখও ওর অচেনা। বারোজন নাৎসী পার্টি সদস্য আর্ম চেয়ারে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। সমস্ত চ্যান্সেলারীতেই যেন উইক এণ্ডের হাওয়া বইতে সুরু করেছে।

হিটলারের সিনিয়ার এ্যাডজুটেন্ট শাউবের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াতে সুখী হয় স্পীয়ার। কারণ ফ্যুয়েরারের মুড কি রকম তা' শাউবের চাঁদপানা মুখ থেকে আন্দাজ করা যায়। স্পীয়ার ওকে চেনে ১৯৩৩

সাল থেকে। আর তখন থেকেই শাউব হিটলারের এ্যাডজুটেন্ট। মত্তপ এবং গুণ্ডা প্রকৃতির। স্পীয়ার ভেবেছিল টেলিফোনে অনুমতি নিয়ে তবে হিটলারের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। কিন্তু শাউব মিনিট পাঁচেক পরেই এসে হাজির হয়। ফ্যুয়েরার স্পীয়ারের সঙ্গে দেখা করার জন্য প্রস্তুত।

স্পীয়ার একাই আপার বাংকার পেরিয়ে পুরোন লোহার সিঁড়ি বেয়ে নীচের চেম্বারগুলোয় নামে। অবশ্য স্পীয়ার মনে মনে তখন ভাবছে, কি ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি ওকে পড়তে হবে। সিঁড়ির নীচেই দেখা হয়ে যায় মার্টিন বোরম্যানের সঙ্গে। বোরম্যান তখন হাসছে। স্পীয়ারকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে বোরম্যান বলে,—তুমি যখন ফ্যুয়েরারের সঙ্গে কথা বলবে, ফ্যুয়েরার নিশ্চয়ই তখন তোমাকে জিজ্ঞেস করবে যে এই পরিস্থিতিতে কি সবার বাংকারে থাকা উচিত, নাকি ওভার সালজবুর্গে যাওয়াটাই সমীচীন। আমার মনে হয় কি জানো, ফ্যুয়েরারের এখন উচিত দক্ষিণ জার্মানীতে সরে যাওয়া। এই বোধহয় শেষ সুযোগ, যখন দক্ষিণ জার্মানীতে সরে যাওয়া সম্ভব। সুতরাং আপ্রাণ চেষ্টা করো যাতে ফ্যুয়েরার বাংকার ছেড়ে যেতে রাজী হয়।

জীবনে এই প্রথম মার্টিন বোরম্যান একটা কিছু নিয়ে অনুরোধ জানায়। নইলে বরাবর স্পীয়ার লোকটাকে ঘৃণা করে এসেছে। অবশ্য হিটলারকে এসব কথা বলার ইচ্ছে আদৌ ছিল না স্পীয়ারের।

স্পীয়ার হিটলারের ষ্টাডিতে প্রবেশ করে। কোনরকম উষ্ণ অভ্যর্থনা আসে না হিটলারের তরফ থেকে। এমন কি চেয়ারে বসতে পর্যন্ত বলে না। তবু স্পীয়ার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। যাক ওর জীবনটা তা'হলে ছাড় পেয়েছে। দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্তের নীরবতা। হিটলারের মুখাবয়ব সাদা, শূন্যতায় ভরা—যেন অতীতের ছায়ামাত্র অবশিষ্ট। আর্কিটেকচার নিয়ে স্বল্প দু'চারটে কথাবার্তা হয়, হিটলার গ্রেটার লিনৎজের ব্লু-প্রিণ্টটা বার করে ওকে দেখায়। তারপর ওকে এডমিরাল দোয়েনৎসের নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। স্পীয়ার

বুঝতে পারে শেষ পর্যন্ত হিটলার ওর উত্তরাধিকার হিসেবে দোয়েনিৎসকেই নির্বাচন করতে চলেছে। স্পীয়ার মোটামুটি দোয়েনিৎসের প্রশংসা করলেও খুব বেশী একটা বলে না। কারণ অত্যধিক প্রশংসা আবার হিটলারের সন্দেহের উদ্রেক করবে।

এরপরেই হিটলার হঠাৎ আলোচনার মোড় ঘোরায়। জিজ্ঞাসা করে,—আমার কি বার্লিনে থাকা উচিত, নাকি ব্রাখটেসগার্ডেনে চলে যাবো? জেনারেল জোডল আমাকে বলেছে যে এই ব্যাপারে খুব বেশী হলে আর চব্বিশঘণ্টা সময় পাওয়া যাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার।

উত্তরে স্পীয়ার বলে,—ফ্যুয়েরার, আমার মনে হয় যদি আত্মহত্যা করতেই হয়, বার্লিনেই ফ্যুয়েরার হিসেবে তা' করা উচিত। সাপ্তাহন্তিক বিশ্রামালয়ে সেটা শোভনীয় নয়।

—আমারও তাই ধারণা। শুধু তোমার মতামত জানতে চাইছিলাম।

বোরম্যান, জোডল এবং বাওয়ার হিটলারের আল্পসে চলে যাওয়ার পক্ষে থাকলেও স্পীয়ার এবং গোয়েবেলস্ হিটলারের মতোই ওর ঐতিহাসিক ইমেজের ধ্যানধারণা কখনো ছাড়তে পারে নি।

—আমি নিজে যুদ্ধে যাবো না। কারণ আহত হলে রাশিয়ানরা হয়তো বা আমাকে জীবন্ত ধরে ফেলবে। আমি চাই না আমার দেহ নিয়ে শত্রুরা উপহাস করুক। তাই আদেশ দিয়েছি আমার মৃতদেহকে যেন পুড়িয়ে ফেলা হয়। ফ্রাউলাইন ব্রাউনও আমার সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনও শেষ করতে বদ্ধপরিকর। আমার মৃত্যুর আগে ব্লণ্ডিকে আমি গুলি করে মেরে ফেলবো।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নৈরাশ্যভরা গলাতেই হিটলার বলে,—বিশ্বাস করো স্পীয়ার, আমি আমার জীবনের ইতি টেনে দিতে চাই। কয়েকটা মুহূর্ত—তারপরেই আমি সবকিছু থেকে মুক্ত। এই যন্ত্রণাদায়ক অস্তিত্বের হাত থেকে তো রেহাই পাবো।

স্পীয়ারের যখন মানসিক দিক থেকে ভেঙ্গে পড়ার অবস্থা, ঠিক তখনই মিলিটারী রিপোর্ট পেশ করতে জেনারেল ক্র্যাবস্ হাজির হয়। স্পীয়ারও বেঁচে যায়। এই দিনগুলোতে হিটলারকে অনেক শান্ত এবং

কিছুটা বা দার্শনিক দেখায়। কারণ হিসেবে অনেকের ধারণা ডাক্তার মোরেল সেরেগলিও অপারেসনের সময় বাংকার ছেড়ে যাওয়ার আগে হয়তো বা হিটলারকে বুস্টার ডোজে ট্রাংকুলাইজার দিয়েছিল। ট্যাবলেট্ও দিয়ে গিয়েছিল অনেকগুলো। হয়তো বা হিটলারও ব্যাপারটা জানতো।

মিলিটারী কনফারেন্সেও হিটলার আত্মহত্যা এবং তারপর ওর মৃতদেহ আগুনে ভস্মীকৃত করার কথা আলোচনা করে। উপস্থিত সবার জানা থাকলেও বর্তমান যুদ্ধে জার্মানীর অবস্থা আলোচনা করা হয়। কখনো উঁচুগ্রামে আবার কখনো বা গলার খাদ নীচে নামিয়ে। ড্রাগের প্রভাবেই এটা ঘটে। তবে আগের মতো কনফারেন্সটা দীর্ঘ সময় ধরে চলে না। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ শেষ হয়। রিসেপসান লবিতে স্পীয়ারের সঙ্গে ডক্টর গোয়েবেলসের দেখা হয়। ডক্টর মোরেলের ঘরে গোয়েবেলস্ জায়গা নিয়েছে তখন। গোয়েবেলসের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুঝতে পারে স্পীয়ার যে বাস্তব থেকে বাংকারের প্রায় সবাই সরে এসেছে। সেই প্রসঙ্গেই গোয়েবেলস্ ওকে জানায় যে গতকাল থেকে ফ্যুয়েরার পশ্চিমদিকের রণাঙ্গনে যুদ্ধ বন্ধ করে দিয়েছে। যাতে ব্রিটিশ আর আমেরিকানরা বার্লিনে বাধা ছাড়াই ঢুকতে পারে।

স্পীয়ার লক্ষ্য করে গোয়েবেলস্ কিন্তু তখনো হিটলারের মতো ভেঙ্গে পড়ে নি। স্বাস্থ্যও ভালো। পরণে ধবধবে সাদা সার্ট। পালিশ করা ঝকঝকে জুতো। লবিতে স্পীয়ারের সঙ্গে কর্নেল ষ্টাম-ফেগারের দেখা হয়ে যায়। রোগাটে ধরনের পুরুষ। ডাক্তার। ষ্টাম-ফেগার জানায় আপার বাংকারে মাগ্দা শয্যাশায়ী। হৃদকম্পের দরুণ। স্পীয়ার নাৎসী একটা আর্দালীকে মাগ্দার কাছে পাঠিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চায়। স্পীয়ারের ইচ্ছে ছিল মাগ্দার সঙ্গে একা দেখা করার। কারণ সপ্তাহখানেক আগে শোওয়ালেন ওয়াডারে মাগ্দার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল। হাবেল নদীর পাড়ে গাছ-গাছালি ঘেরা সামার হাউসে। স্পীয়ারের অধীনে তখন এক ফ্লিট্ বার্জ ছিল।

তারমধ্যে একটা বার্জে প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী ইত্যাদি ভরে সেলফ-প্রপেলড্ বার্জটাকে মাগ্দা এবং পুত্রকন্যাসহ এলবেতে ভাসিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা দিয়েছিল স্পীয়ার। যাতে আমেরিকানদের কাছে ওরা চলে যেতে পারে।

গোয়েবেলসের উপস্থিতিতে স্পীয়ারের পক্ষে মাগ্দার সঙ্গে বিস্তারিত কথা বলা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। সুতরাং মাগ্দার কুশল জিজ্ঞেসা করেই স্পীয়ারকে উঠে পড়তে হয়। নজর এড়ায় না। মাঝে মাঝেই হিস্টিরিয়ার আক্রমণে মাগ্দা কাবু হয়ে পড়ছে। বিদায় নেওয়ার সময় মাগ্দা বলে,—আমি সুখী যে শেষ পর্যন্ত হেরোল্ড বেঁচে থাকবে।

প্রসঙ্গত, হেরোল্ড ছিল মাগ্দার প্রথম স্বামীর পুত্র সন্তান। কানাডার যুদ্ধবন্দী শিবিরে বন্দী তখন।

এখানে বলাবাহুল্য, মাগ্দার দাম্পত্য জীবন মোটেই সুখের ছিল না। একরকম হিটলারই জোর করে মাগ্দার সঙ্গে গোয়েবেলসের বিয়ে দিয়েছিল। পরস্পর পরস্পরকে প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা করতো। এমনিতেই বার্লিনে গোয়েবেলসের প্রেমিক হিসেবে কিছুটা সুনাম ছিল। ১৯৩৮ সালে গোয়েবেলস্ তখন পাঁচ সন্তানের জনক, প্রেমে পড়ে চেক সিনেমার অভিনেত্রী লিডা বারোভার সঙ্গে। দু'জনে একসঙ্গে বাসও করতো। ওদিকে গোয়েবেলসের স্ত্রীও প্রেমে পড়ে ওর অধীনস্থ তরুণ কর্মচারী কাল হাংকের সঙ্গে। হিটলার পুরো ব্যাপারটা জানলেও কিছু বলে নি। আর গোয়েবেলসের নাৎসী পার্টিতে প্রতিপত্তির দরুণ কোন পত্রিকা ব্যাপারটা নিয়ে স্ক্যাণ্ডাল করতে সাহস পায় নি।

অবশ্য ১৯৩৮ সালে বায়ারুথ সামার ফেষ্টিভ্যালে হিটলার যখন উইনফ্রিড ভাগ্নারের ব্যক্তিগত অতিথি, গোয়েবেলস্ও তখন সেখানে উপস্থিত। বিশেষ:করে ভাগনারের ক্রিস্টান এবং ইসোলডি অপেরায়। মাগ্দা কাঁদতে কাঁদতে হিটলারকে বলে যে ও হাংকেকে বিয়ে করতে বদ্ধপরিকর। সুতরাং গোয়েবেলস্কে ডিভোর্স করতে

চায়। হাংকে কিন্তু হিটলারের ধারে পাশেই ঘেঁষে নি ব্যাপারটা নিয়ে।

পরের দিন সকালে হিটলার গোয়েবেলস্‌কে আদেশ দেয় লিডার সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙ্গে দিয়ে ওকে প্রাগে ফেরত পাঠাতে। গোয়েবেলসের সামনে তখন চরম দ্বন্দ্ব উপস্থিত; হয় লিডাকে পরিত্যাগ করতে হবে না হয় মন্ত্রীত্ব হাতছাড়া। আশ্চর্যের ব্যাপার গোয়েবেলস্‌ মন্ত্রীত্ব ছাড়ার জন্যই শেষ-মেষ নিজেকে প্রস্তুত করে নেয়। পরিবর্তে হিটলারকে অনুরোধ করে অ্যামবাসাডর হিসেবে ওকে জাপানে পাঠিয়ে দিতে। এই ঘটনাটা পরবর্তী তিন তিনটে বছর হিটলার আর গোয়েবেলসের সম্পর্কের ওপর টানা পোড়ানির মেঘ সৃষ্টি করেছিল। শেষ পর্যন্ত গোয়েবেলস্‌কে হিটলারের কাছে নতি স্বীকার করে লিডাকে শুভ বিদায় জানাতে হয়। ১৯৩৮ সালের শেষের দিকের ঘটনা এটা। হাংকেকে গোয়েবেলস্‌ চাকরী থেকে বরখাস্ত করে। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলে পরে হাংকে স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যেতে চায়। ১৯৪২ সালে গোয়েবেলসের সর্বকনিষ্ঠ কন্যা সন্তান হাইডি জন্মগ্রহণ করে। বার্লিনের বাসিন্দারা হাইডিকে আবার ওদের যোগসেতু হিসেবে বললেও সত্যিকারের ভাঙ্গা সম্পর্ক আর কখনো জোড়া লাগে নি। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গোয়েবেলস্‌ যেমন লিডাকে ভুলতে পারে নি, তেমনি মাগ্‌দাও ভোলে নি কার্ল হাংককে। হিটলারের পরে হাংকের ওপর আবার আস্থা ফিরে এসেছিল। ১৯৪৩ সালে হিটলার হাংকেকে বার্লিনের গাউলাউটার করে। এমন কি হাইনরিখ্‌ হিমলারের জায়গায় ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী হিসেবে হাংকেকেই মনোনীত করেছিল। ১৯৪১ সালের বসন্তকালে মাগ্‌দা পাঁচ সন্তান সহ জার্মানী থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ব্রেগাঞ্জা, অষ্ট্রিয়া সুইস বর্ডারের কাছাকাছি ওদের গ্রেপ্তার করে বার্লিনের রাইখ চ্যান্সেলারীতে নিয়ে আসা হয়। মাগ্‌দার পালানোর চেষ্টার পেছনে রাজনৈতিক কোন দুরভিসন্ধি নেই দেখে হিটলার ওকে ক্ষমা করে। অবশ্য তার পেছনে আরো একটা কারণ ছিল। রাশিয়া

আক্রমণের ঠিক আগে রুডলফ্ হাস্ ১৯৪১ সালের মে মাসে স্কটল্যাণ্ড পালায়। খবর হু'টো পৃথিবীর সমস্ত সংবাদপত্রে প্রাধান্য পাবে ভেবে হিটলার আর ব্যাপারটাকে ঘাঁটায় না।

১৯৪৩ সালের প্রথম দিকে স্টালিনগ্রাদ্ পতনের পর হিটলারের সঙ্গে গোয়েবেলসের আগের সম্পর্ক আবার ফিরে আসে।

স্পীয়ার মাগদার ঘর ছেড়ে বেরতে গিয়ে দেখে মাগ্দার তিন ছেলেমেয়ে হেলডা, হেলডি আর হেলমুট করিডরে একটা বল নিয়ে ছোটাছুটি করে খেলছে। বাকী ছোট তিন জন বিছানায় শুয়ে। ওদের আর বিরক্ত করে না স্পীয়ার। এক রকম নিঃশব্দেই সরে পড়ে।

॥ ছয় ॥

২৮শে এপ্রিল। রাশিয়ানরা প্রতিটি মুহূর্তে বাংকারের দিকে এগিয়ে আসছে। নেকের প্রতিরোধের কোন খবরাখবরই নেই। তার মধ্যে বি বি সি ষ্টকহোলম্ থেকে রয়টার একটা খবর প্রচার করে। হাইনরিখ্ হিমলার পর্যন্ত ভাঙ্গা জাহাজ ছেড়ে যাওয়ার জন্য তৈরী। সুইডেনের কাউন্ট বারনাডোটের সঙ্গে তলায় তলায় ঠিক করেছে, আইজেনহাওয়ারের কাছে ওর অধীনস্থ সেনাবাহিনীসহ আত্মসমর্পণ করবে। বাংকারের সবাই খবরটাতে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। হিটলার তো রেগে অস্থির। চোখমুখের চেহারাই বদলে যায়। গোয়েরিং নাৎসী বাহিনীর কর্ণধার হওয়ার জন্য তবু হিটলারের অনুমতি চেয়েছিল। কিন্তু হিমলার? হিটলারের মতে জার্মানীর ইতিহাসে এতো বড় বিশ্বাসঘাতক আর দেখা যায় নি।

ইতিমধ্যে আরো খবর আসে যে রেড আর্মি পটাশডামের প্লাট্‌ৎজের কাছাকাছি এসে গেছে। ৩০শে এপ্রিল সকালে সম্ভবত চ্যান্সেলারী আক্রমণ করবে। অর্থাৎ মাঝে মাত্র তিরিশ ঘণ্টা সময়। সুতরাং হিটলারকে যা হয় মন স্থির করে ফেলতে হবে। তার জন্য সময়ও বেশী নেই। পরের প্ল্যানগুলো মুহূর্তে ছকে ফেলে হিটলার। ইভা ব্রাউনের সঙ্গে বিয়েটা সেরে ফেলতে হবে। শেষের উইল তৈরী করতে হবে। গ্রীহাম হানা রিটস্‌কে আদেশ দেয় জার্মান এয়ার ফোর্স যেন সর্বশক্তি নিয়ে চ্যান্সেলারীর দিকে আগুয়ান রেড আর্মির ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এবং যেভাবেই হোক বিশ্বাসঘাতক হিমলারকে গ্রেপ্তার করে।

—একজন বিশ্বাসঘাতক আমার উত্তরাধিকারী হ'তে পারে না। সুতরাং তোমাদের এই ব্যাপারে আমাকে নিশ্চিন্ত করা কর্তব্য।

তবে হিমলারের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা নেওয়ার মতো সময় হিটলারের কোথায়। হাতের কাছে তখন রয়েছে হিমলারের সহচর। এস এস জেনারেল ফেগেলিন। হিমলারের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে ওকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গার্ড হাউস থেকে আনা হয়। তারপর হিটলারের আদেশে চ্যান্সেলারীর বাগানে নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয় ফেগেলিনকে। ফেগেলিন ইভা ব্রাউনের ছোটবোনের স্বামী হলেও ইভা কিন্তু ওকে রক্ষা করার কোন চেষ্টাই করে না। শুধু ফেগেলিনকে গুলি করে হত্যা করার আদেশ শুনে ইভা বলেছিল,—হতভাগ্য আড্‌লফ। সবাই ওকে ছেড়ে গেছে। ওকে হারানোর চেয়ে দশ হাজার জার্মানের মৃত্যুও জার্মানীর কাছে কিছু নয়।

জার্মানীকে হারালেও হিটলার কিন্তু এই মুহূর্তগুলোয় ইভাকে জিতেছিল। ২৯শে এপ্রিল দুপুর একটার থেকে তিনটের মধ্যে উপপত্নী ইভার ইচ্ছানুসারে হিটলার ওকে বিয়ে করে বিবাহিতা স্ত্রীর মর্যাদা দেয়। কারণ হিটলার সদাসর্বদা বলতো, দাম্পত্য জীবন যাপন করার মতো সময় ওর কোথায়। প্রথমে পার্টিকে ক্ষমতায় এনে জার্মান জাতিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে পরিগণিত করার জন্যই ও

উৎসর্গীকৃত। এখন অবশ্য সেইসব কথা আর আসে না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হিটলার এই পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার জন্য মনস্থির করেছে। তাই হয়তো বা বিয়ে করতে রাজী হয়ে যায়।

চ্যান্সেলারীর কিছুটা দূরে যুদ্ধরত এক মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলারভাল্টার ভাগ্নারকে এই কাজের জন্য ধরে নিয়ে আসে। বাংকারের ছোট্ট কনফারেন্স রুমে বিয়ের বাসর বসে। সংক্ষিপ্ত ছোট্ট অনুষ্ঠান। ভাগ্নারের সামনে শপথ করে বলে যে ওরা উভয়েই সম্পূর্ণ আর্যবংশীয়। এবং দুরারোগ্য কোন ব্যাধিতেও ভুগছে না। কাগজের ফাঁকা জায়গায় বাবার নামের পদবী হিটলার শিক্লগ্রুবার লেখে। তারপর মা'র নাম, এবং শেষে বিয়ের তারিখ। ইভা নিজের নাম স্বাক্ষর করতে গিয়ে প্রথমে ব্রাউন লিখে কেটে দিয়ে ইভা হিটলার লেখে। গোয়েবেলস্ এবং বোরম্যান:সাক্ষী হিসেবে বিয়ের দলিলে স্বাক্ষর করে।

অনুষ্ঠান পর্ব চুকলে হিটলারের প্রাইভেট অ্যাপার্টমেন্টে সুরু হয় বিয়ের ব্রেকফাস্ট। শ্যাম্পেন পান করে সবাই। এই অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে সেক্রেটারীদের সঙ্গে হিটলারের নিরামিষ রাঁধুনী ফ্রাউলাইন মেনজেলেকেও নিমন্ত্রণ করা হয়। জেনারেলদের মধ্যে ক্র্যাবস। বুর্গডর্ফ, বোরম্যান এবং ডক্টর ও ফ্রাউ গোয়েবেলস্। টেবিলে পুরনো সেই সুখের দিনগুলোর কথা ওঠে। বিশেষ করে গোয়েবেলসের বিয়ের সময়, যখন সেই পার্টির নায়ক ছিল স্বয়ং হিটলার। শেষে হিটলার বলে যে ওর জীবনের শেষ মুহূর্ত উপস্থিত। সঙ্গে সঙ্গে ন্যাশানাল সোস্যালিজিমেরও যবনিকা ঘটবে। কথাটায় উপস্থিত সবার মধ্যে শোকের ছায়া নামে। অনেকেই কাঁদতে সুরু করে। একসময় হিটলার নিশ্চুপে পাশের ঘরে গিয়ে সেক্রেটারী ফ্রাউ গারট্রুডে ইয়ুঙেকে ডেকে পাঠায়। ওর শেষ দলিলের ডিকটেসান দিতে সুরু করে।

—ত্রিরিশ বছর আগে যে প্রথম মহাযুদ্ধ রাইখের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাতে আমি সামান্য একজন সেবক হিসেবে

যোগদান করেছিলাম। এই দীর্ঘ তিরিশ বছর জার্মানীর অধিবাসীদের ভালোবাসা বিশ্বস্ততাই আমাকে সামনের পথে চালনা করেছে। আমার চিন্তাধারা রূপ নিতে সাহায্য করেছে। সংকটময় মুহূর্তে সেই কারণেই আমি সঠিক চিন্তা করতে পেরেছি।

একথা সত্যি নয় যে আমি বা আমাদের মধ্যে কেউ ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ চেয়েছিলাম। আন্তর্জাতিক রাজনীতিবিদ যারা স্বয়ং ইহুদী বা ইহুদীদের সমর্থন করে, তারাই এই যুদ্ধে আমাদের টেনে নামিয়েছে।

আমি চেষ্টা করেছি এড়িয়ে যেতে, কিন্তু তা' সত্বেও এই যুদ্ধের দায়ভার একরকম জোর করে আমার ওপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকার সঙ্গে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার কোনরকম ইচ্ছেই আমার ছিল না। শতাব্দী চলে যাবে, কিন্তু আমাদের পুঞ্জীভূত ঘৃণা থাকবে যারা সত্যিকারের এই যুদ্ধের জন্য দায়ী। আন্তর্জাতিক ইহুদী চক্র এবং তাদের সমর্থন-কারীদের এই ব্যাপারে ধন্যবাদ জানাতে হয়।

ইংল্যাণ্ডের শাসকবর্গ কিছুটা ব্যবসার দরুণ আর বাকীটা আন্তর্জাতিক ইহুদী চক্রের চাপে পড়ে এই যুদ্ধ বাধিয়েছে। দীর্ঘ ছ' বছর ব্যাপি যুদ্ধে হয়তো বা অনেকবার আমরা পেছু হটেছি, তবু তা' ইতিহাসে একটা জাতির অস্তিত্ব রক্ষার প্রচেষ্টার কথা হিসেবে লেখা থাকবে। এই রাজ্যের রাজধানীকে আমার পক্ষে ভোলা সম্ভব নয়। এই শহরের লক্ষ লক্ষ বাসিন্দাদের সঙ্গেই আমার ভাগ্য আমি মিলিয়ে নিতে চাই। আর কোনক্রমেই নিজেকে শত্রুদের হাতে ধরা দিতে চাই না। যাদের চোখে এখন আন্তর্জাতিক ইহুদীদের চশমা আঁটা।

এই সব ভেবেচিন্তে আমি মনস্থির করেছি যে শহর বার্লিনেই আমি থাকবো এবং আত্মহত্যা করবো। কারণ ফ্যুয়েরার এবং চ্যান্সেলার হিসেবে আত্ম-মর্যাদার সঙ্গে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখা আর সম্ভব নয়। চাষী আর শ্রমিকদের উন্নয়নে আমাদের এই প্রচেষ্টা ভবিষ্যতের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। আর আজ যে বীজ বোনা হলো, একদিন তা' এক মহীরুহের জন্ম দেবে। সেই গাছের ছায়ায়

জন্ম নেবে একটা জাতির ন্যাশনাল সোস্যালিষ্ট সংগ্রাম। তাদের মনে থাকবে যে ন্যাশনাল সোস্যালিষ্ট সংগ্রামের সৃষ্টিকর্তা এবং প্রতিষ্ঠাতা কাপুরুষের মতো আত্মসমর্পণ বা পদত্যাগ করার চেয়ে মৃত্যুকেই শ্রেয় বলে মনে করেছিল।

আগামীদিনের জার্মান সেনাবাহিনীর প্রতি আমার নির্দেশ রইলো যে তারা যেন কোন শহর বা জেলাকে শত্রুদের হাতে তুলে দেওয়ার বদলে মৃত্যু পর্যন্ত তাদের ওপরে ন্যস্ত কর্তব্য শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করে।

আমার মৃত্যুর আগে আমি পার্টি থেকে ভূতপূর্ব রাইখ মার্শাল হারম্যান গোয়েরিংকে বরখাস্ত করলাম। ২৯শে জুন, ১৯৪১ সালে তাকে যেসব ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল তা'ও ফিরিয়ে নেওয়া হলো। তার জায়গায় এডমিরাল দোয়েনিৎসকে পার্টির প্রেসিডেন্ট করা হলো এবং সেই হলো আর্মড ফোর্সের সুপ্রীম কম্যাণ্ডার। আমার মৃত্যুর পূর্বে ভূতপূর্ব রাইখ ফ্যুয়েরার এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হাইনরিখ হিমলারকে পার্টি থেকে বরখাস্ত করলাম। সঙ্গে সঙ্গে যে সব কাজের সঙ্গে সে যুক্ত, সেইগুলো থেকেও তাকে মুক্তি দেওয়া হলো।

আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়াও গোয়েরিং আর হিমলার গোপনে শত্রুপক্ষের সঙ্গে বোঝাপড়ায় এসে জাতির চরিত্রে কালি মাখিয়ে দিয়েছে। উপরন্তু অবৈধ উপায়ে দেশের শাসনভার হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টাও করেছে।

সর্বোপরি, আমার দেশের সরকার এবং লোকেরা যেন জাতকে সবার উপরে স্থান দেয়। প্রাণপণ চেষ্টা রাখতে হবে, যাতে আন্তর্জাতিক ইহুদীরা বিভিন্ন জাতির শরীরে বিষ ঢালতে না পারে।

সংগ্রামের বছরগুলোতে, আমি ভাবতাম বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু মৃত্যুর আগে মনস্থির করেছি যে মহিলা দীর্ঘদিন ধরে আমাকে প্রেরণা দিয়ে এসেছে, তাকে স্ত্রী হিসেবে মর্যাদা দিতে। আমার ভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্য মেলাতে সে স্বেচ্ছায় এই শহরে এসেছে। আমার সঙ্গে সে মৃত্যুবরণ করতেও প্রস্তুত। দেশের কাজ করতে গিয়ে ওর প্রতি যে অবিচার আমি

করেছি, তার কিছুটা ক্ষতিপূরণ হয়তো বা এর দ্বারা হবে।

আমার বলতে যা কিছু আছে, তার মালিক হবে পার্টি। আর আমার মৃত্যুর পর পার্টির অস্তিত্ব যদি না থাকে, তবে তার মালিকানা গিয়ে বর্তাবে জাতির। আর জাতিই যদি ধ্বংস হয়ে যায় তবে আর কোনরকম নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি না। ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখার জন্য বহু ছবি আমি বছরের পর বছর ধরে কিনেছি। যাতে দানিয়ুবের প্রান্তে আমার শহর লিনৎসেতে একটা আর্ট গ্যালারী করতে পারি।

বোরম্যানের ওপরে দায়িত্ব দেওয়া থাকলো যাতে আমার ব্যক্তিগত স্মৃতি বলতে যা থাকবে তা' যেন আমার আত্মীয়স্বজনের হাতে তুলে দেয়। আমার স্ত্রী এবং আমি আত্মসমর্পণ বা পরাজয়ের লজ্জা এড়াতে মৃত্যু বরণ করছি। গত বারোটা বছর ধরে যেখানে বসে আমি আমার জাতির সেবা করেছি, সেইখানেই যেন আমাদের দেহ দুটোকে আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়।

বলাবাহুল্য হিটলার দলিলে আত্মীয়স্বজনদের নাম উল্লেখ না করলেও মৌখিক নির্দেশ দিয়েছিল যে ব্যক্তিগত স্মৃতি এর বোন প্লাউলা আর এর শাশুড়িকে অর্থাৎ ইভার মাকে দেওয়া হয়।

ডিকটেশন দিতে দিতে ক্লান্ত হিটলার যখন বিছানায় যায় তখন বার্লিনের আকাশে অন্ধকার পাতলা হয়ে এসেছে। আলোর ইসারা জেগেছে। শহরের ওপরে দিগন্তের নীচে ধোঁয়ার কুণ্ডলি জ্বলছে। রেড আর্মি পয়েন্ট ব্ল্যাংক পজিসন থেকে কামান দেগে চলেছে। উইলহেলম ষ্ট্রাসে আর চ্যান্সেলারীর কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

হিটলার ঘুমোতে গেলে বোরম্যান এবং গোয়েবেলস ব্যস্ত হয়ে পড়ে। হিটলারের রাজনৈতিক দলিলে দু'জনে সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করেছে। ফ্যুয়েরার আদেশ দিয়েছিল এরা যেন বাংকার ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে নতুন গঠিত সরকারে যোগদান করে। বোরম্যানের ফ্যুয়েরারের এই আদেশ পালনে এতোটুকু অনীহা ছিল না। বরং ব্যাপারটাতে ও রীতিমতো উৎসাহী। বোরম্যান কখনোই হিটলারের সহযুক্ত হতে

চায়নি। বরাবরই ক্ষমতাকে ভালোবেসে এসেছে। এবার হয়তো বা দোয়েনিৎসের অধীনে সেই সেই লোভের চরিতার্থ করা সম্ভব। ইতি-মধ্যে গোয়েরিং যাতে সিংহাসন দখল না করতে পারে তার জন্যে তড়িঘড়ি একটা সংবাদ রেডিওগ্রামে পাঠায়।

—বার্লিনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যদি পতন ঘটে, তবে ২৯শে এপ্রিলের বিশ্বাসঘাতককে নির্মূল করতে হবে। তোমরা যারা কর্তব্যরত, তাদের সম্মান এবং জীবন এর ওপরেই নির্ভর করছে।

এটা হলো সোজাসুজি গোয়েরিং এবং এয়ারফোর্সের বিদ্রোহী ষ্টাফদের হত্যার আদেশ। বোরম্যান ওদের আগেই নাৎসী বাহিনীর অধীনে গ্রেপ্তার করে রেখেছে।

ডক্টর গোয়েবেলস্ কিন্তু ইভা ব্রাউনের মতোই হিটলারবিহীন জার্মানীতে আর বেঁচে থাকতে চায় নি। হিটলারের দৌলতেই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠেছে। মিথ্যা প্রচারের ব্যাপারে রূপকথার রাজকুমার সিংহাসনে বসেছে। হিটলারের মতো গোয়েবেলসেরও ধারণা ওর মৃত্যু ভবিষ্যতের ন্যাশানাল সোস্যালিজমের প্রদীপে আবার আগুন জ্বালাতে সাহায্য করবে।

বাংকারের ছোট্ট ঘরে গোয়েবেলস্ বর্তমান এবং ভবিষ্যতের বংশ-ধরদের প্রতি লিখতে বসে। নাম দেয়,—ফ্যুয়েরারের রাজনৈতিক দলিলের সংযোজন।

ফ্যুয়েরার আমাকে বার্লিন ছেড়ে গিয়ে তার নির্দেশে নতুন গঠিত সরকারে যোগদানের আদেশ দিয়েছে।

জীবনে এই প্রথম আমি ফ্যুয়েরারের আদেশ অমান্য করলাম। আমার স্ত্রী এবং সন্তানেরাও আমার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। বিশ্বস্ততা এবং মনুষ্যত্ব বোধই ফ্যুয়েরারের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে তাকে ছেড়ে যেতে আমাকে বাধা দিয়েছে। বাকী জীবন অসামাজিক ও বিশ্বাসঘাতক হিসেবে স্বমর্যাদা হারানো এবং পরবর্তী নাগরিকদের ঘৃণার পাত্র হওয়ার চেয়ে এই পথটাকেই বেছে নেওয়া আমি যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি।

যুদ্ধের জটিল দিনগুলোয় যখন ফ্যুয়েরারকে বিশ্বাসঘাতকেরা ঘিরে ধরেছে, তখন অন্তত একজনও থাকা উচিত যে ফ্যুয়েরারের মৃত্যুতে তার সঙ্গী হবে।

আমার বিশ্বাস আমি তাই ভবিষ্যত জার্মানদের জন্য সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কর্তব্য সম্পাদন করতে চলেছি। এমন একদিন আসবে, যখন মানুষের চেয়ে উদাহরণের মূল্য দেবে মানুষ অনেক বেশী।

এইসব কারণেই আমার স্ত্রীর সঙ্গে এবং সন্তানদের তরফে মৃত্যু-বরণকেই শ্রেয় বলে মেনে নিলাম। সন্তানেরা এতো ছোট যে মুখ ফুটে কিছু বলা ওদের পক্ষে সম্ভব নয়। বার্লিনের পতন ঘটলেও এই শহর ছেড়ে যাবো না। ব্যক্তিগতভাবে মনে করি ফ্যুয়েরারের কাজে না লাগলে এ জীবনের কোন মূল্য নেই।

ডক্টর গোয়েবেলসের 'ফ্যুয়েরারের রাজনৈতিক দলিলের সংযো-জন। লেখাটা যখন শেষ হয়, রাত কেটে গিয়ে ২৯শে এপ্রিলের সকালের আলো আকাশে ফুটে উঠেছে। ঘড়িতে বাজে সাড়ে-পাঁচটা। যুদ্ধের গোলাগুলির ধোঁয়ায় সূর্যটাকে ঢেকে রেখেছে। এখন সমস্যা হলো কীভাবে রেড আর্মির বেড়াজাল ভেদ করে হিটলারের শেষ রাজনৈতিক দলিলটাকে দোয়েনিৎস এবং অন্যান্যদের হাতে পৌঁছে দেওয়া যায়। যাতে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য তা' সংরক্ষিত থাকতে পারে।

মূল্যবান দলিলের কপিগুলো নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনজনকে বাছাই করে দায়িত্ব দেওয়া হয়। হিটলারের মিলিটারী এ্যাডজুটেন্ট জোহানমায়ার, এস এস অফিসার এবং বোরম্যানের মিলিটারী উপদেষ্টা উইলহেলম জাণ্ডার আর প্রপাগাণ্ডা মিনিষ্ট্রির অফিসার হাইনজ লোরেঞ্জ। এই লোরেঞ্জই আগের রাত্রে রেড আর্মির ব্যুহ ভেদ করে হিমলারের বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ বাংকারে নিয়ে এসেছিল। ওকেই হিটলারের দলিল ফিল্ড মার্শাল ফার্দিনান্দ শ্রোয়েনারের হাতে পৌঁছে দিতে হবে। যার সৈন্যরা তখনো বিভিন্ন পাহাড় পর্বতে লুকিয়ে থেকে শত্রুদের মোকাবিলা করে চলেছে।

জাওার আর লোরেঞ্জের ওপর ভার পড়ে ওদের কপিগুলো দোয়েনিৎসের হাতে পৌঁছে দিতে।

বার্তাবাহক তিনজনে শেষ অপরাহ্নে ওদের এই বিপদজনক কর্তব্য সম্পাদন করতে বেরোয়। টিয়ারগার্টেন এবং শার্লোটনবুর্গের মধ্যে দিয়ে যায় পিচেলডর্ফের হাবেল লেকের মাথার দিকে। সেখানে হিটলার ইয়ুথ ব্যাটালিয়ন তখনো পর্যন্ত নেকের অস্তিত্ববিহীন সৈন্যবাহিনীর আসার অপেক্ষায় সেতুটাকে আঁকড়ে নিজেদের দখলে রেখেছে। পিচেলডর্ফে পৌঁছতে গিয়ে তিন জায়গাতে ওদের রেড আর্মির বেড়াজাল ভেদ করতে হয়। টিয়ারগার্টেনের মাঝামাঝি ভিক্টরী কলামে, পার্কের পেছনে জু স্টেশনে এবং পিচেলডর্ফের কাছাকাছি। আরো অনেকগুলো বাধা পেরিয়ে ওরা যখন ভ্রোয়েনারের কাছে পৌঁছয়, তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। সংবাদগুলো আর কোন প্রয়োজনেই আসে না।

বার্তাবাহক তিনজন বাংকার ছেড়ে যাওয়ার পরে ২৯শে এপ্রিল সন্ধ্যা বেলায় হিটলার রোজের মতো ঠাণ্ডা মেজাজেই মিলিটারী কনফারেন্সে বসে। চলে দীর্ঘ ছ'ঘণ্টা ধরে। যেন সোভিয়েট বাহিনীর অগ্রগতি তখনো অব্যাহত। জেনারেল ক্রেবস্ রিপোর্ট দেয় যে রাতে আর তোর সকালে রেড আর্মির চ্যান্সেলারীর দিকে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। বেশ কিছুটা ইতিমধ্যে এগিয়ে এসেছে। শহর রক্ষাকারীদের কাছে যুদ্ধের রসদ প্রায় নিঃশেষ। কিন্তু নেকের উদ্ধারকারীদের সৈন্যদলের কোন চিহ্নও দেখা যায় না। বাংকারের তিনজন মিলিটারী এ্যাডজুটেন্টের কাজ বলতে কিছু নেই, উপরন্তু মৃত্যু এড়াতে নেকের বাহিনীর খোঁজে বেরোবার নাম করে উইকেলের দিকে বাংকার ছেড়ে তারাও চলে যায়।

হিটলারের এয়ার ফোর্স এ্যাডজুটেন্ট কর্নেল নিকোলাউস ওদের সঙ্গে যোগ দেয়। অবশ্য সঙ্গে নিয়ে যায় হিটলারের দেওয়া বিশেষ আদেশ, জেনারেল কাইটেল বিশ্বাসঘাতক। সুতরাং তার আর এই পৃথিবীতে থাকার কোন অধিকার নেই। হিটলার ক্রমেই জার্মান

সেনাবাহিনীর ব্যর্থতায় এবং বিশ্বাসঘাতকতায় তিক্ত হয়ে পড়ছিল। রাত দশটায় যখন মিলিটারী কনফারেন্স শেষ হয়, তখন হিটলার জার্মান সেনাবাহিনীর ওপরে রীতিমতো বীতশ্রদ্ধ। জেনারেল ওয়েডলিং হিটলার ইয়ুথ বাহিনী নিয়ে তখনো সমানে যুঝে যাচ্ছে। এবং ওর জন্যই হিটলার অতিরিক্ত কয়েকটা দিন বার্লিনের বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে পারে। ওয়েডলিং জানায় রেড আর্মি সারল্যাণ্ড ষ্ট্রাসে এবং উইলহেলম্ ষ্ট্রাসে ধরে প্রায় এয়ার মিনিষ্ট্রির কাছাকাছি এসে গেছে। এয়ার মিনিষ্ট্রি থেকে চ্যান্সেলারী পাথর ছোড়া দূরত্ব মাত্র। ওর ধারণায় এক দু'দিন অর্থাৎ খুব বেশী দেরী হলে ১লা মে'র মধ্যে রেড আর্মি চ্যান্সেলারীতে পৌঁছে যাবে।

শেষ পর্যন্ত হিটলারেরও ঘুম ভাঙে। নেকের বাহিনী আর কোন দিনই বার্লিনে পৌঁছাবে না। শহরের পতন আসন্ন। তাই ভন বেলোকে বলে কাইটেলকে জানাতে যে হিটলার পৃথিবী ছেড়ে যাচ্ছে। দোয়েনিৎস হলো ওর মনোনীত উত্তরাধিকারী। আরো বলে যে এই যুদ্ধে সাধারণ সৈনিক এবং জনসাধারণ যে সাহস ও বীর্য দেখিয়েছে, তার তুলনা নেই। শুধু জেনারেলদের অক্ষমতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার দরুণ জার্মানী এই যুদ্ধ রক্ষা করতে পারে নি।

২৯শে এপ্রিল অপরাহ্ণে একটা খবর বাংকারে চাউর হয়ে পড়ে যে মুসোলিনি এবং তার রক্ষিতা ক্লারা পেডাচি মারা গেছে। ২৬শে এপ্রিল কোমো থেকে সুইজারল্যাণ্ডে পালিয়ে যাওয়ার সময় উভয়ে পার্তিজানদের হাতে ধরা পড়ে। এবং দু'দিন পরে ওদের হত্যা করা হয়। ২৮শে এপ্রিল শনিবার রাতে মৃতদেহ দু'টোকে খোলা লরীতে করে মিলানে এনে পিজা অর্থাৎ গণিকালয়ের কাছে উন্মুক্ত রাখা হয়। পরের দিন গোড়ালিতে দড়ি বেঁধে মৃতদেহ দু'টোকে ঝোলানো হয় ল্যাম্পপোষ্টে। এবং পরে দড়ি কেটে দেহ দু'টোকে নর্দমায় ফেলে দেওয়া হয়। এই ভাবেই দুচের এবং ফ্যাসিজিমের জায়গা হয় ইতিহাসে।

হিটলার এই সংবাদে আগেই স্থির করা মনটাকে আরো দৃঢ় করে।

যাতে ইহুদীরা ওর এবং ইভার মৃতদেহ নিয়ে এভাবে অবমাননা করার সুযোগ না পায়। এই খবরের পরে হিটলার আত্মহত্যার তোড়জোড় সুরু করে। প্রিয় অ্যালসেসিয়ান কুকুর ব্লণ্ডিকে বিষ দিয়ে হত্যা করে, বাকী কুকুর দুটোকে গুলি করে হত্যা করা হয়। তারপর মহিলা দু'জন সেক্রেটারীকে ডেকে বিষের ক্যাপসুল হাতে তুলে দেয়। যাতে বর্বর রেড আর্মি বাংকারে ঢুকলে ওরা ইচ্ছে করলে ক্যাপসুল খেয়ে আত্মহত্যা করতে পারে। এই উপলক্ষ্যে হিটলার দুঃখ প্রকাশ করে বলে যে উপহার হিসেবে এর চেয়ে ভালো কিছু দিতে না পেরে ও আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তবে দীর্ঘ সময় ধরে বিশ্বস্ততার সঙ্গে ওরা যেভাবে ওদের কর্তব্য সম্পাদন করেছে তা' বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

আডলফ্ হিটলারের জীবন-সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। সেক্রেটারী ফ্রাউ ইয়ুঙকে ডেকে ওর ফাইলের সমস্ত কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলতে বলে এবং আদেশ দেয় পরবর্তী আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত কেউ যেন বিছানায় না যায়। সবাই ধরে নেয় জিরো আওয়ার উপস্থিত। কিন্তু হিটলারকে শেষ বিদায় জানানোর জন্য সবাইকে অপেক্ষা করতে হয় রাত প্রায় আড়াইটে পর্যন্ত। নিজের কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে ডাইনিং হলের প্যাসেজে আসে হিটলার। জনা কুড়ি লাইন ধরে দাঁড়িয়ে। বেশীর ভাগই মেয়েছেলে। সবার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে এগিয়ে যায় হিটলার। চোখের জলে ওর দৃষ্টি তখন আবছা হয়ে এসেছে। বাংকারের দেওয়াল পেরিয়ে দূরে কোথাও ওর দৃষ্টি নিবদ্ধ। মুখে বিড়বিড় করে কিছু বললেও তা' স্পষ্ট বোঝা যায় না। এরপরেই একটা অবাক করা ব্যাপার ঘটে। ক্যান্টিনে জড়ো হয়ে সবাই নাচতে সুরু করে। ফ্যুয়েরারের লৌহ কঠিন নাগপাশ এই মুহূর্তে শিথিল হয়ে পড়েছে। কয়েক ঘণ্টা পরেই হয়তো বা রাশিয়ানরা বাংকারে এসে হাজির হবে। সেই ভয়ও ওদের এই মুহূর্তের আনন্দে ঘাটতি আনতে পারে না। ওদের গলার স্বর আনন্দে এতো উঁচুতে ওঠে যে ফ্যুয়েরারের কোয়ার্টার থেকে গোলমাল থামাতে অনুরোধ করা হয়।

তবে বোরম্যান কিন্তু এই আনন্দে যোগ দেয় নি। ওর সেই সময় এবং সুযোগ তখন কোথায়। বাংকার ছেড়ে পালাবার সুযোগ ওর ক্রমশ কমে আসছে। কারণ হিটলারের মৃত্যুর পরেই রাশিয়ানদের বাংকারে ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা। সুতরাং ত্রস্ত হাতে দোয়েনিৎসকে আবার একটা সংবাদ পাঠায় বোরম্যান।

দোয়েনিৎস,

বার্লিনের থিয়েটার দল যে বেশ ক'দিন ধরে আলসের মতো দাঁড়িয়ে আছে, সেই সম্পর্কে আমাদের ধারণা আরো দৃঢ় হচ্ছে। বাইরে থেকে আমাদের উদ্দেশ্যে যেসব সংবাদ পাঠানো হচ্ছে—কাইটেল সব ধ্বংস করে ফেলছে। ফ্যুয়েরারের আদেশ এই মুহূর্তে সমস্ত বিশ্বাসঘাতকদের প্রতি নির্দয় হোন।

পুনঃ দিয়ে আবার সেই সংবাদের সঙ্গে যোগ করে। ফ্যুয়েরার এখনো বেঁচে এবং শহর বার্লিন রক্ষাকাজে ব্যস্ত।

কিন্তু বার্লিন তখন রক্ষার বাইরে চলে গেছে। রাশিয়ানরা প্রায় সমস্ত শহরই দখল করে বসে আছে। এখন সবচেয়ে বড় হয়ে যে প্রশ্নটা দেখা দেয় তা'হলো চ্যান্সেলারী রক্ষা। তার অবস্থাও সঙ্গীন। ৩০শে এপ্রিলের বিকেলের মিলিটারী কনফারেন্সে বসে হিটলার এবং বোরম্যান বুঝতে পারে যে এটাই শেষ মিলিটারী কনফারেন্স। রেড আর্মি টিয়ারগার্টেনের পুব প্রান্তে পৌছে গেছে। এবং পটাশডাম প্লাট্‌ৎজের দিকে বন্যার গতিতে এগিয়ে চলেছে। দূরত্ব এক কিলো-মিটারও হবে কিনা সন্দেহ। সুতরাং হিটলারের পক্ষে আর কালক্ষেপ করা সম্ভব নয়।

ইভার লাঞ্চ নেওয়ার মতো মনের অবস্থা ছিল না। হিটলার ওর দু'জন সেক্রেটারী এবং নিরামিষ রাঁধুনীর সঙ্গে লাঞ্চ সারতে বসে। নিরামিষ রাঁধুনী সম্ভবত বুঝতে পারে নি যে ওর হিটলারের জন্য তৈরী করা এটাই শেষ ভোজ। তখন রাত প্রায় আড়াইটা। ওরা যখন খাওয়া-দাওয়া করেছে সেই সময় এরিখ খেমকার ওপরে আদেশ আসে তৎক্ষণাৎ দু'শো লিটার পেট্রোল যেন জেরিক্যানে করে চ্যান্সেলারীর

বাগানে জড়ো করে। এতো পেট্রোল জোগাড় করে ওঠা খেমকার পক্ষে কঠিন হলেও একশো আশী লিটার জোগাড় করে অপর তিনজনের সাহায্যে বাংকারের ইমারজেন্সী একস্‌জিষ্টের কাছে এনে রাখে খেমকা।

এদিকে পেট্রোল রাখার সংবাদ পেয়ে হিটলার খাওয়া শেষ করে ইভা ব্রাউনকে সঙ্গে নিয়ে ওর নিকটতমদের কাছ থেকে বিদায় নিতে প্রস্তুত হয়। ডক্টর গোয়েবেলস্, জেনারেল ক্র্যাবস্, বুর্গডর্ফ, সেক্রেটারীরা এবং রাঁধুনী ফ্রাউলাইন মেন্‌জেলে। ফ্রাউ গোয়েবেলস্ আসে না। ইভা ব্রাউনের মতো স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হতে রাজী হলেও নিজের ছ'ছটা সন্তান হত্যার কথা ভেবে নার্ভাস হয়ে পড়ে। গত ছ'দিন ধরে তারা বাংকারের এখানে ওখানে খেলাধূলা করেছে; কিন্তু জানে না ওদের ভাগ্যের নিষ্ঠুর লেখাটার কথা। দু'তিন দিন আগের সন্ধ্যায় ফ্রাউলাইন রিটিখ্‌কে বলেছিল,—হাঁনা, যখন শেষ মুহূর্ত আসবে ছেলেমেয়ে সম্পর্কে যদি দুর্বল হয়ে পড়ি, তুমি কিন্তু আমাকে সাহায্য করো। ওরা হলো থার্ড রাইখ আর ফ্যুয়েরারের সন্তান; যদি এই দু'য়ের অস্তিত্বই না বজায় রইলো, ওরা নিরাশ্রয় হয়ে পড়বে। আমার সবচেয়ে বড় ভয় শেষ সময়ে না আমি দুর্বল হয়ে পড়ি। এর পরের ক'টা দিন ওর নিজের ছোট্ট ঘরে মাগ্‌দা নিজেই একাকী দিনগুলো কাটায়।

হিটলার আর ইভা ব্রাউনের সামনে তো এসব সমস্যা নেই। শুধু নিজেদের জীবনের ইতি টেনে দেওয়া। বিদায় নেওয়ার পালা শেষ হলে ওরা নিজেদের ঘরে ফিরে যায়। প্যাসেজে ডক্টর গোয়েবেলস্, বোরিম্যান এবং আরো কয়েকজন অপেক্ষা করে। মিনিট কয়েক পরেই রিভলবারের গুলির আওয়াজ পাওয়া যায়। দ্বিতীয়বার আর কোন শব্দ আসে না। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ওরা ফ্যুয়েরারের ঘরে ঢোকে। আডলফ্ হিটলারের শরীর সোফার উপরে ছড়িয়ে, রক্ত গড়িয়ে পড়েছে। ওর পাশেই ইভা ব্রাউন। দুটো রিভলবার মেজেতে পড়ে। ইভা রিভলবার ব্যবহার করে নি। বিষ খেয়েছে।

৩০শে এপ্রিল, ১৯৪৫ সাল রাত সাড়ে তিনটের সময়—ছাপান্নতম

জন্মদিনের দশদিন পরে হিটলার তার জীবনের যবনিকা টানে। জার্মানীর চ্যান্সেলার হওয়ার এবং থার্ড রাইখের প্রতিষ্ঠার পরে বারো বছর তিনমাস এবং একদিন কেটেছে। বলাবাহুল্য, থার্ড রাইখ আর মাত্র সপ্তাহখানেক তার অস্তিত্ব ধরে রাখতে পেরেছিল।

এরপরে হিটলারের মৃতদেহের শোকযাত্রা শুরু হয়। নিঃশব্দে। শুধু শব্দ বলতে রাশিয়ান বোমার শেল্ চ্যান্সেলারীর বাগানে পড়ে সশব্দে বিদীর্ণ হয়ে আশেপাশের দেওয়ালগুলো থরথর করে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। হিটলারের পরিচারক হাইনজ্ লিঙে এবং একজন আর্দালী হিটলারের মৃতদেহ, বিশেষ করে ওর বিধ্বস্ত মুখাবয়ব আর্মি ফিলড গ্রে কম্বলে ঢেকে বয়ে নিয়ে আসে। খেমকা দেখে কম্বলের বাইরে বেরিয়ে রয়েছে হিটলারের পরা কালো ট্রাউজার এবং জুতো। ফিলড্ গ্রে জ্যাকেট। হিটলার সর্বদা এই পোষাকই পরতো। ইভা ব্রাউনের মৃতদেহে রক্তের চিহ্ন নেই। বোরম্যান ইভার মৃতদেহ ঘর থেকে বাইরে বয়ে এনে খেমকাকে দেয়। পরণে কালো ড্রেস। শরীরে বা মুখাবয়বে এতোটুকু বিকৃতির চিহ্ন নেই।

মৃতদেহদুটোকে বাইরে এনে সদ্য কামানের গোলার আঘাতে সৃষ্টি হওয়া একটা গর্তে রেখে পেট্রোল ঢেলে দেয়। গোয়েবেলস্ এবং বোরম্যান সঙ্গে সঙ্গে ইমারজেন্সী গেটের ভেতরে চলে আসে। রেড আর্মির বোমার হাত থেকে নিজেদের বাঁচানোর জন্য। মৃতদেহ দুটোয় লেলিহান আগুন জ্বলে উঠলে ডান হাত তুলে উভয়ে শেষ বারের মতো স্যালুট দেয়। বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারে না সেখানে। বৃষ্টির মতো রেড আর্মি কামান দেগে চলেছে। একটু পরেই প্রজ্জ্বলিত মৃতদেহ দুটোকে ফেলে রেখে বাকী সবাই বাংকারের নিরাপদ দূরত্বে সরে আসে। গোয়েবেলস্ এবং বোরম্যানের থার্ড রাইখের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে তখনো কিছু কাজ বাকি।

দোয়েনিৎসের কাছে হিটলারের আদেশ নিয়ে তখনো বার্তাবাহক পৌঁছয়নি ভেবে বোরম্যান রেডিওতে ম্যাসেজ পাঠায়।

গ্র্যাণ্ড এডমিরাল দোয়েনিৎস,

ভূতপূর্ব রাইখ মার্শাল গোয়েরিংয়ের পরিবর্তে ফ্যুয়েরার আপনাকেই তার উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করেছেন। ফ্যুয়েরারের লিখিত আদেশ বার্তাবাহক আপনার কাছে নিয়ে যাচ্ছে। পরিস্থিতি বিচার করে যা যা করনীয় করবেন। লক্ষ্য করার বিষয় হিটলারের মৃত্যু সম্পর্কে একটা কথাও রেডিও ম্যাসেজে নেই।

দোয়েনিৎস তখন উত্তর দিকের জার্মান সেনাবাহিনী পরিচালনায় ব্যস্ত। হেডকায়ার্টারও ইতিমধ্যে স্লুইসভিগের প্লোয়আনে সরিয়ে নিয়ে এসেছে। পার্টির অন্যান্য নেতাদের মতো ওরও হিটলারের উত্তরাধিকারী হওয়ার এতোটুকু ইচ্ছে ছিল না। মাথাতে এইরকম চিন্তাও ঢোকে নি। দু' দিন আগে ভেবেছে হিমলারই হবে হিটলারের উত্তরাধিকারী। তাই হিমলারকে সমস্ত রকম সাপোর্ট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে নেভী এডমিরাল দোয়েনিৎস। কিন্তু হিটলারের আদেশ মান্য করার তাগিদে হিটলার তখনো বেঁচে আছে ভেবে খবর পাঠায়:

প্রিয় ফ্যুয়েরার,

আপনার প্রতি আমার বিশ্বস্ততায় এতোটুকু খাদ নেই। বার্লিনে আপনার নিরাপত্তার খাতিরে আমার পক্ষে যতোটুকু করা সম্ভব, প্রাণ দিয়ে তা করবো। ভাগ্য যদি আমাকে থার্ড রাইখের শাসন ব্যবস্থা তুলে নিতে বাধ্য না করে, তবে শেষ পর্যন্ত জার্মান জাতির শৌর্যপূর্ণ যুদ্ধের মধ্যে আমি আমার সমাপ্তি রেখা টানতে চাই।

গ্র্যাণ্ড এ্যাডমিরাল দোয়েনিৎস

সেই রাত্রেই গোয়েবেলস্ এবং বোরম্যানের মাথায় নতুন একটা আইডিয়া আসে। তখনো জেনারেল ক্র্যবস বাংকারে রয়েছে। ওর মাধ্যমেই রাশিয়ানদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসতে চেষ্টা করে। জেনারেল ক্র্যবস্ একদা মস্কোতে এ্যাসিস্টেন্ট মিলিটারী অ্যাটাচি হিসেবে কাজ করেছে। সুতরাং রাশিয়ান ভাষা ওর জানা। এমন কি মস্কো রেলওয়ে ষ্টেশনে একবার ষ্টালিনের সঙ্গে বিশেষ উৎসব উপলক্ষ্যে আলিঙ্গনও করেছিল জেনারেল ক্র্যবস্। যাদ বলশেভিকদের থেকে কিছু পাওয়া যায়। বিশেষভাবে বোরম্যান আর গোয়েবেলস্

ওদের কাছ থেকে আশা করেছিল চারিত্রিক নিষ্কলংকের সার্টি-ফিকেট। যাতে ওরা দোয়েনিৎসের নতুন গঠিত সরকারে যোগদান করতে পারে। পরিবর্তে বার্লিনকে রেড আর্মির কাছে আত্মসমর্পণে ওরা বাধ্য করবে।

৩০শে এপ্রিল শেষ রাতের দিকে একজন জার্মান অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে জেনারেল ক্র্যাবস্ জেনারেল চুকভের দপ্তরে যায়। ক্র্যাবস্ই প্রথমে মুখ খোলে: আজ পয়লা মে। আমাদের উভয় জাতির পক্ষেই উৎসবের দিন। তাই না?

চুকভ উত্তর দেয়: আমাদের কাছে আজ মহোৎসব। তবে আপনাদের কাছে দিনটা কিরকম তা' বলতে আমি অক্ষম।

রাশিয়ান জেনারেল চুকভ বিনাসর্তে বাংকারের সবার এবং বার্লিনের সমস্ত জার্মান সৈন্যের আত্মসমর্পণ দাবী করে। এদিকে পয়লা মে বেলা এগারোটা পর্যন্ত ক্র্যাবস্কে ফিরতে না দেখে বোরম্যান অধৈর্য হয়ে দোয়েনিৎসকে আবার রেডিও ম্যাসেজ পাঠায় যে হিটলারের আদেশ কার্যকরী করা হয়েছে এবং শীঘ্রই তা পালন করতে ও দোয়েনিৎসের সঙ্গে মিলিত হ'তে চলেছে। এবারেও কিন্তু হিটলারের মৃত্যুর খবরটা ভাঙে না বোরম্যান। ওর ইচ্ছে ছিল দোয়েনিৎসের সঙ্গে দেখা করে নিজের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত হওয়ার পরে সব খুলে বলবে। কিন্তু গোয়েবেলস্ স্ত্রী পুত্র কন্যাসহ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সত্য বলতে দ্বিধা করে না। বাংকার থেকে বাইরে এটাই শেষ রেডিও ম্যাসেজ।

॥ অত্যন্ত গোপনীয় ॥

গতরাত ৩—৩০ মিনিটে ফ্যুয়েরার আত্মহত্যা করেছে। ২৯শে এপ্রিলের রাজনৈতিক দলিলে আপনাকেই উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে।

ফ্যুয়েরারের আদেশ অনুযায়ী সেই দলিল বাংকার ছেড়ে আপনার হাতে পৌঁছে দিতে বার্তাবাহক পাঠানো হয়েছে। বোরম্যান আজই বাংকার ছেড়ে আপনার কাছে যেতে চাইছে। এবং সাক্ষাতে পরিস্থিতি

বলবে। সেনাবাহিনী এবং সংবাদপত্রে কখন বিবরণ দেবেন, তার ভার আপনার ওপরেই দেওয়া রইলো। সংবাদের প্রাপ্তি স্বীকার করবেন।

গোয়েবেলস্।

গোয়েবেলস্ অবশ্য ওর নিজের ইচ্ছেটা নতুন নেতাকে জানাবার প্রয়োজন বোধ করে নি। পয়লা মে'র সন্ধ্যাতেই প্রথমে খেলাধুলারত ছয় ছেলেমেয়েদের ডেকে প্রাণঘাতী ইনজেকসান দেয়। আগের দিন যে চিকিৎসক হিটলারের কুকুর দু'টোকে ইনজেকসান দিয়ে হত্যা করেছিল, সেই চিকিৎসকই ইনজেকসানগুলো দেয়। এরপরে গোয়েবেলস্ ওর এ্যাডজুটেন্ট গুন্থার শোয়েগারম্যানকে ডেকে কিছু পেট্রোল জোগাড় করতে বলে ওকে বলে: পৃথিবীর ইতিহাসে জঘন্যতম বিশ্বাসঘাতকতা এটা। জেনারেলরা একজোট হয়ে ফ্যুয়েরারের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সবকিছু হারিয়ে গেছে। আমি আমার পরিবার সহ আত্মহত্যা করবো।

এ্যাডজুটেন্টকে ও বলে না গোয়েবেলস্ যে কিছুক্ষণ আগেই ও তার সন্তানদের হত্যা করেছে।

—তোমার ওপরে দায়িত্ব দেওয়া থাকলো আমাদের মৃতদেহগুলোকে ভস্মীভূত করার। পারবে কি এই দায়িত্ব পালন করতে?

শোয়েগারম্যান দায়িত্ব পালনে ওর সক্ষমতার কথা জানিয়ে দু'জন আর্দালীকে পেট্রোল জোগাড় করতে পাঠায়। কয়েক মিনিট পরে, সন্ধ্যে সাড়ে আটটা বাজে তখন। বাইরে সন্ধ্যার অন্ধকার সবেমাত্র ঘনাতে সুরু হয়েছে। ডক্টর এবং ফ্রাউ গোয়েবেলস্ বাংকারের করিডর ধরে হাঁটে। যাদের সঙ্গে করিডরে দেখা হয়ে যায়, বিদায় নেয় তাদের কাছ থেকে। তারপর বাংকারের সিঁড়ি বেয়ে বাগানে আসে। ওদের অনুরোধে এক আর্দালি ওদের মাথার পেছন দিকে দু'টো গুলি করে। চার ক্যান পেট্রোল মৃতদেহ দু'টোর ওপরে ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। তবে মৃতদেহ দু'টো দগ্ধ হওয়া পর্যন্ত কেউ অপেক্ষা করে না। সবাই বাংকার ছেড়ে যাওয়ার জন্য তখন অস্থির। মৃতদেহ দু'টো ভস্মীভূত করার দিকে কারোরই নজর দেওয়ার মতো সময় সুযোগ

নেই। পরের দিন রাশিয়ানদের হাতে ডক্টর এবং ফ্রাউ গোয়েবেলসের অর্ধদগ্ধ মৃতদেহ পড়লেই ওরা চিনতে পারে। এখানে প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে হিটলার এবং ইভা ব্রাউনের হাড়ের চিহ্নও রাশিয়ানরা পায় নি। কারণ রেড আর্মির কামানের গোলার আগুনে তা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল।

পয়লা মে রাত ন'টার পরে বাংকার ছেড়ে যাওয়ার ধুম পড়ে। প্রায় পাঁচ ছ'শো লোক। ইতিমধ্যে নিউ চ্যান্সেলারীর লোকজনও যোগ দিয়েছে ওদের সঙ্গে। ঠিক হয় সাবওয়ে ট্রাক ধরে হেঁটে যাবে ষ্টেশনের নীচে উইলহেলম প্লাট্‌ৎজে। তারপর চ্যান্সেলারীর উল্টোদিকে ফ্রেডরিখ্‌ ষ্ট্রাসের রেলষ্টেশনে। স্প্রী নদী পেরিয়ে রাশিয়ান ব্যুহ ভেদ করে শেষে উত্তর দিকে যাত্রা করবে।

জেনারেল ক্র্যাবস্‌ চুকভের কাছ থেকে বাংকারে যখন ফিরে আসে, বোরম্যান দলের সঙ্গে পালানোই স্থির করে। একটা জার্মান ট্যাংকের পেছনে পেছনে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই জার্মান ট্যাংকটা রাশিয়ান শেলের আঘাতে জ্বলে ওঠে। বোরম্যান সামান্যর জন্য বেঁচে যায়। কিন্তু পালানো অসম্ভব দেখে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে। চাঁদের আলোয় ওর মৃতদেহটা পড়ে থাকে সেতুর নীচে ইনভ্যালিডেন্‌ ষ্ট্রাসে রেললাইনের ওপরে। জেনারেল ক্র্যাবস্‌ এবং বুর্গডর্ফ বাংকার ছেড়ে পালায় নি। ওরা নিউ চ্যান্সেলারীর সেলারে আত্মহত্যা করে। এরপরে থার্ড রাইখের অস্তিত্ব বজায় ছিল মাত্র সাত দিন। মে মাসের সাত তারিখে রাত দেড়টার সময়ে দোয়েনিৎস্‌ বিনাসর্তে আইজেন-হাওয়ারের দাবী মতো ডেনমার্কের সীমান্তে ফ্লেনস্‌বুর্গে নতুন করা হেডকোয়ার্টারে বিনাসর্তে জার্মানীর আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করে।

॥ সাত

শেষেরও শেষ আছে। দোয়েনিৎস ডেনমার্ক সীমান্তের ফ্লানস্‌বুর্গে যে মেরুদণ্ডহীন সরকার হিটলারের নির্দেশে গঠন করেছিল, মিত্রশক্তির আদেশে ১৯৪৫ সালের ২৩শে মে তা' ভেঙে দেওয়া হয়। এবং সেই সরকারের সমস্ত সদস্যকে গ্রেপ্তার করে। হাইনরিখ্‌ হিমলারকে কিন্তু ছ'ই মে তারিখে সরকার থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। কারণ রিয়েমে মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে হিমলার ভেবেছিল মিত্রশক্তির সুনজরে পড়বে। এস এস চীফ, যে একদিন কথায় কথায় লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন নিয়েছে, শেষে নিজের জীবনের ভয়ে এগারোজন এস এস অফিসার সহ ২১শে মে ব্রিটিশ এবং আমেরিকান সৈন্যদের ব্যূহ ভেদ করে ব্যাভেরিয়ার দিকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। গোঁফ কামিয়ে, বাঁ চোখের ওপর কালো একটা পট্টি বেঁধে সাধারণ নাগরিকের ছদ্মবেশে রওনা হয় হিমলার। হামবুর্গ এবং ব্রেমেনহাভেনের মাঝামাঝি একটা জায়গায় ব্রিটিশ পেট্রোল বাহিনী ওদের থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে সুরু করলে হিমলার এক ব্রিটিশ আর্মি ক্যাপ্টেনের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে ফেলায় সঙ্গে সঙ্গে ওকে নিয়ে যাওয়া হয় সেকেণ্ড আর্মি হেডকোয়ার্টার লিণ্ডনবুর্গে। সেখানে বিবস্ত্র করে সার্চ করার পর ব্রিটিশ আর্মির জামা-কাপড় পরানো হয়। যাতে জামা কাপড়ের ভেতরে বিষ লুকিয়ে রাখতে না পারে। কিন্তু তল্লাশীটা ভালো মতো করা হয়

নি। ২৩শে মে দ্বিতীয় দফায় ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের অফিসার যখন মণ্টগোমারীর হেড কোয়ার্টার থেকে ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে আসে, এবং একজন মেডিকেল অফিসারকে ওর মুখাবয়ব পরীক্ষা করতে বলে, হিমলার মাড়ীর গর্তে লুকানো পটাসিয়াম সায়ানাইডের ক্যাপস্যুলে কামড় দিয়ে বারো মিনিটের মধ্যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। অনেক চেষ্টা করেও ওকে আর বাঁচানো যায় নি।

হিটলারের বাকী সঙ্গী-সাথীদের জীবন তবু কিছুটা দীর্ঘায়িত হয়েছিল। নুরেমবার্গের ইন্‌টারন্যাশানাল মিলিটারী ট্রাইবুনেলের ডকে দেখে এদের বোঝার এতোটুকু জো ছিল না যে এরাই একদিন ছিল বিশ্বত্রাস। ময়লা জামাকাপড় পরনে, ভয়ে জড়সড়। প্রায় একুশজন এইরকম বিচারাধীন অবস্থায় ডকে নিয়মিত উপস্থিত থাকতো। গোয়েরিং প্রায় আশী পাউণ্ড দৈহিক ওজন হারিয়েছে। পরিধানে রঙচটা এয়ারফোর্সের ইউনিফর্ম। সামনের সারির সামনে বিচারের আশায় নিয়মিত এসে বসতো রুডলফ্ হেস্—নাৎসী বাহিনীতে ইংল্যাণ্ডে পালাবার আগে যার স্থান ছিল তৃতীয়, চোখ কোটরে বসে গিয়ে তখন একেবারে ভাঙা মানুষ। রিবেনট্রপ সম্পূর্ণ ফ্যাকাসে এবং বিপর্যস্ত। কাইটেল তো নিজেকে এই পরিবেশে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে। রোজেনবার্গ তো ডকে বসেও আপন মনে নাৎসী পার্টির ফিলোসফি আওড়ে চলেছে।

জুলিয়স স্ট্রিগার—ইহুদী নিধনে দক্ষ সাডিষ্ট টাক পড়া কাক চক্ষু এমনভাবে ডকে বসে থাকতো, যেন জীবনে কোন দোষই করে নি। সাক্ষাৎ যীশু। ফ্রিটজ্ শাউখেলের ওপর থার্ড রাইখের দাস শ্রমিকের ভার দেওয়া হয়েছিল। দেখেই বোঝা যেতো স্নায়ু যুদ্ধে লোকটা ক্ষতবিক্ষত। তার পাশে বসতো বালডুর ভন শিরাখ্। হিটলার যুব বাহিনীর নেতা। এবং ভিয়েনার গাউলাউটার; দেহের ধমনীতে জার্মানের চেয়ে বেশী পরিমাণে আমেরিকান রক্ত প্রবাহিত। স্কুল থেকে ওকে তাড়িয়ে দেওয়ার পরে নাৎসী দলে গিয়ে ভিড়েছিল। ওয়ালথার ফুংক এবং ডক্টর শাখ্‌ট; যুদ্ধের শেষের দিকে হিটলার

শাখ্‌টকে বন্দী করে থার্ড রাইখের কনসেনট্রেসান ক্যাম্পে পাঠায়। এখন মিত্রশক্তি ওকে আবার যুদ্ধ অপরাধী হিসেবে বিচারের জন্য কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে।

ফ্রানজ্‌ ভন পাপেন—হিটলারের ক্ষমতায় আসার পেছনে যার প্রচেষ্টা সম্ভবত সবচেয়ে বেশী ছিল। সত্যিকারের বয়েসের চেয়ে অনেক বেশী বয়স্ক দেখায়, চোখে বৃদ্ধ শিয়ালের চোরা দৃষ্টি। হিটলারের প্রথম বৈদেশিক মন্ত্রী মুরোথও বিধ্বস্ত। ভেঙ্গে পড়ে নি শুধু স্পীয়ার। ট্রায়ালে যে কখনো কিছু লুকোবার চেষ্টা করে নি। সোজাসুজি বক্তব্য রেখেছে সায়েস্‌ ইনকার্ট অষ্ট্রীয়ার কুইস্‌লিং। জোডল এবং দু'জন গ্র্যাণ্ড এডমিরাল রিডার ও দোয়েনিৎসও উপস্থিত ছিল ডকে। দোয়েনিৎসকে দেখে তো বোঝারই উপায় নেই যে হিটলার ওর ওপরে এতোবড় একটা দায়িত্ব দিয়েছিল। পুরনো রঙচটা জামাকাপড়ে শুধ্য ক্লার্ক বলে মনে হয়। কালটেনব্রুনার, ঘাতক হিসেবে যার পরিচিতি—সব দোষ অস্বীকার করে বসে। হানস্‌ ফ্রাংক—পোল্যাণ্ডের ধ্বংসের জন্য যে সম্পূর্ণরূপে দায়ী, জিজ্ঞাসাবাদের সময়ে সে বলে যে ও নাকি নতুন এক ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পেয়েছে যার কাছে ও ক্ষমাপ্রার্থী। ফ্রিক অসুস্থ হয়ে পড়ে। ভালো করে ডকে দাঁড়াবার মতো শরীরের ক্ষমতা ও হারিয়ে ফেলেছে। হান্‌স ফ্রিট্‌জে গোয়েবেলসের মতো যার গলার স্বর বলে গোয়েবেলস্‌ ওকে প্রপাগাণ্ডা মিনিষ্ট্রীর অফিসার করেছিল, ওর তো ধারণাই নেই যে কেন ওর মতো ক্ষুদ্র একজনকে ধরে এনে ডকের ওপরে দাঁড় করানো হয়েছে।

ফ্রিট্‌জে, শাখট্‌ এবং পাপেনের বিচারে জেল হলেও বেশীদিন জেল খাটতে হয় নি ওদের। মিলিটারী ট্রাইবুনালের বিচারে হেস, রিডার এবং ফুংকের যাবজ্জীবন কারাবাস হয়। স্পীয়ার এবং শিরাখের কুড়ি বছর। মুরোথের পনরো বছর আর দোয়েনিৎসের দশ বছরের জেল। বাকী সবার ওপরে ফাঁসির আদেশ।

১৯৪৬ সালের ১৬ই অক্টোবর মুরেমবার্গের জেলে বেলা একটা বেজে এগারো মিনিটে ফাঁসির দড়ি গলায় পরে রিবেনট্রপ। কিছুক্ষণ

পর পরই সেই একই দড়িতে ঝোলানো হয় কাইটেল, কালটেনব্রুনার, রোজেনবার্গ, ফ্রাংক, ফ্রিক্, স্ট্রিটগার, সায়েস ইনকার্ট, শাউখেল এবং জোডলকে।

তবে হারম্যান গোয়েরিংকে ফাঁসির দড়িতে ঝোলানো সম্ভব হয় নি। ঘাতককেও প্রতারণা করেছিল। মৃত্যুর ঘণ্টা দু'য়েক আগে স্মাগল করে আনা বিষের ক্যাপসুল খায়। হিটলার এবং হিমলারের মতো শেষ সময়ে পৃথিবী থেকে নিজেই সরে দাঁড়ায়।